আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার দ্বাবিংশ গ্রন্থ

লীলার স্বপ্ন

(উপন্যাস)

রিজিয়া-প্রণেতা

শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ, বি-এল্

প্রণীত

অগ্রহায়ণ—১৩২৪

অবতরণিকা

এই আখ্যায়িকাটি একটি প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। পাটনের ভবানী-মন্দির হইতে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে ভাস্করাচার্য্য পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সহ্যাদ্রির পাদদেশে অবস্থিত বিজ্জড়বিড় নাম গ্রামে, দৈবজ্ঞ-চূড়ামণি মহেশ্বরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, করণ-কুতূহল ও বাসনাভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ভাস্কর-ব্যবহার ও ভাস্কর-বিবাহপটল নামক দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থও তাঁহার রচিত। বিদুষী লীলাবতী এই ভাস্করাচার্য্যেরই পত্নী। ভাস্করাচার্য্য পরম তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ছিলেন। লীলাবতীর জীবনের কাহিনী অবলম্বনেই এই উপন্যাসখানি লেখা হইয়াছে।

গ্রন্থকার

লীলার স্বপ্ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

অভিনয় দর্শনে

উজ্জয়িনী নগরে নির্ম্মলতোয়া কলনাদিনী সিপ্রাতটে মর্ম্মরময় বিশাল রঙ্গালয়। আজ এখানে মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অভিনয়। নটরাণী অনুপম-সৌন্দর্য্যশালিনী বাসবদত্তা শকুন্তলার

ভূমিকায় রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার অসামান্য অভিনয় চটুলতায় দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। শকুন্তলা তপোবনের বৃক্ষ-বাটিকায় উদ্যান-বৃক্ষের আলবালে জলসেচন করিতেছেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহার ঘট সলিলপূর্ণ করিয়া দিতেছে। সখিগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ ও পরিহাস রসিকতার কথা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী কৌতূহল-পূর্ণ নেত্রে রঙ্গালয়ের দিকে বদ্ধদৃষ্টি রহিয়াছে।

সহসা, রঙ্গালয়ের সর্ব্ব-সম্মুখস্থ আসনের প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একজন দর্শক ধীরে ধীরে সেই পথে রঙ্গগৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি আসন গ্রহণ করিল। আগন্তুকের আকৃতি দীর্ঘ, বাহু আজানুলম্বিত, বক্ষ বিশাল, ললাট প্রশস্ত, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাহার কেশ দীর্ঘ, কুঞ্চিত ও গুচ্ছিত। তাহার গায়ে আগুল্‌ফলম্বিত একটি দীর্ঘ ঢিলা গৈরিক অঙ্গরাখা। আগন্তুকের দেহে যৌবনের মসৃণতা, বদনে শৈশবের সরলতা, হাবভাবে বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য। তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিই পূর্ণ ও সুন্দর। তাহার মধ্যে, আবার তাহার চক্ষু দুইটি একটু বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক! আয়ত, পদ্মদলের ন্যায় সুগঠন ও সান্ধ্যতারার ন্যায় উজ্জ্বল ও অন্তরানুসন্ধায়ী। তাহাতে কঠোরতার লেশ মাত্র নাই। আগন্তুক আসন গ্রহণ করিয়াই একবার পার্শ্বস্থ আসনে উপবিষ্ট দর্শকদিগকে দেখিয়া লইলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি অনতিদূরস্থিত একখানি আসনে উপবিষ্ট একটি ষোড়শী যুবতীর দিকে আবদ্ধ হইল। দুইটি বিভিন্ন প্রকারের তড়িচ্ছক্তি যেমন

পরস্পর সন্নিকটে আসিলে একটি অত্যুৎকট জ্বালা উৎপাদিত করে, যুবতীর দৃষ্টিও আগন্তুকের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে প্রতিহত হইয়া তাহার হৃদয়ে যেন বিষম একটি আঘাত করিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "ও লোকটার চাহনি কি কঠোর, যেন খেয়ে ফেল্‌তে আস্‌ছে।" যুবতীর বর্ষীয়সী মাতা তাহার কাছেই বসিয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে তাড়নার ছলে কহিলেন, "মানুষের পানে অমন ড্যাব্‌ড্যাব্‌ ক'রে না চাইলেই হয়।" কন্যা মাতার উপদেশ গ্রহণ করিয়াই হউক, অথবা নিজের ইচ্ছামতই হউক, আর সেদিকে মুখ ফিরাইল না।

এ দিকে নাটকের এক অঙ্ক শেষ হইয়া গেল। নটনটীগণ দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য বেশ পরিবর্ত্তন করিতে নেপথ্যাভিমুখে গেল।

দর্শকগণও ক্ষণকালের জন্য বিরাম লাভ করিলেন। পরস্পর আলাপচারি করিতে লাগিলেন।

আগন্তুককে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, একজন যুবক, জনতা ঠেলিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "একি! ভগবান্ ভাস্করাচার্য্য এখানে! আমার ধারণা ছিল যে আপনি বোধ হয় এ সকল ছেব্‌লামি ব্যাপারে নাই!"

ভাস্করা। কালিদাসের শকুন্তলা কি ছেব্‌লামি?

যুবক। ছেব্‌লামি না হলেও একটু আদি-রস-ঘটিত।

ভাস্করা। অর্থাৎ নবরসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস। সকল রসের প্রধান বলিয়াই, ইহার নাম আদিরস।

যুবক। হ'তে পারে। তবে, আমি ততটা নাটকের পক্ষপাতী নহি। আমার কাছে নাচগান খুব ভাল লাগে।

ভাস্করা। নাটক যদি ভাল নাই লাগে, তবে এখানে আসার প্রয়োজন?

যুবক। খাতিরে।

ভাস্করা। না! খাতির নয়! নিয়তির আকর্ষণে! মিহিরগুপ্ত, ওই দেখ! আমার আসন হইতে সপ্তম আসন খানিতে উপবিষ্ট ওই যে যুবতী দেখিতে পাইতেছ, উহাকে তুমি চেন?

যুবক। না, আমি উহাকে আর কখনও দেখি নাই। আজ এখনই, প্রথম দেখিতেছি।

ভাস্করা। ওই রমণী তক্ষশিলা নগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী ধনপতির একমাত্র কন্যা.৩

তাহার অগাধ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধি-
কারিণী।

যুবক। তাহাতে আমার কি ?

ভাস্করা। ওই রমণীই তোমার ভাবী পত্নী। মিহিরগুপ্ত! উহাকে বিবাহ কর। উহার পিতার বহুকষ্টে সঞ্চিত অর্থে তোমার ঋণজাল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লও!

যুবক। ভাস্করাচার্য্য! তোমার গণনা-শক্তি অসামান্য, জ্যোতিষে তোমার অধিকার অমানুষিক। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে, তোমার এই ভবিষ্যৎবাণীটিকে মিথ্যা সপ্রমাণিত কর্‌তে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব। আমি কিছুতেই ওই শ্রেষ্ঠী কন্যাকে বিবাহ্ কর্‌ব না। বিবাহ্ করা দূরে থাক্, আমি তার সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্তও কর্‌ব না। দেখি, কেমন করে তোমার গণনা ঠিক হয় ?

ভাস্করাচার্য্য ঈষদ্ধাসিয়া কহিলেন "বিবাহ তোমাকে করিতেই হইবে। আজ রাত্রেই তুমি উহার সহিত পরিচিত হবে।"

ঠিক এই সময়েই পট উত্তোলিত হইল। ভাস্করাচার্য্য রঙ্গালয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। মিহিরগুপ্তও আপন আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। কিন্তু, তিনি আর অভিনয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে এক মাত্র চিন্তা "সত্য সত্যই কি এই শ্রেষ্ঠী দুহিতা তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে! ভবিষ্যতে যাহা হয় হউক! কিন্তু আজ রাত্রে আমি কিছুতেই এই রমণীর সহিত পরিচিত হইব না। ভাস্করাচার্য্যের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অন্ততঃ সম্পূর্ণ রূপ নিষ্ফল করবো।"

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইলেই,

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাস্করাচার্য্য প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। মিহিরগুপ্তও উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রঙ্গালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিলেন। উভয়েরই যান অশ্ব-সংযোজিত হইতেছিল। সেই অবসরে তাঁহারা উভয়ে একটু কথোপকথন করিতেছিলেন। ভাস্করাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণী যে মিথ্যা হইতে বসিয়াছে, শ্রেষ্ঠী কন্যার সহিত আজ রাত্রেই তাঁহার যে আলাপের সম্ভাবনা একান্ত অসম্ভাবিত হইয়া আসিতেছে এই মনে করিয়া তিনি মনে মনে একটু হৃষ্টও হইতেছিলেন।

মিহির। অভিনয় কেমন দেখ্‌লেন, ভাস্করাচার্য্য ?

ভাস্করা। বেশ, সুন্দর! তোমার কাছে কেমন লাগ্‌লো ?

মিহির। অতি জঘন্য! রাত দিন

বিরহের ফোঁস্‌ফোঁস্‌ দীর্ঘশ্বাস আর প্যান্‌প্যান্‌ কান্না কি ভাল লাগে ?

ভাস্করা। সেই জন্যই বুঝি পালা শেষ না হ'তে হতেই উঠে পালাচ্ছ ?

মিহির। অবশ্য একটা কারণ তাই বটে। তবে আরও একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

ভাস্করাচার্য্য ও মিহিরগুপ্তে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে একজন যুবক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া আসিয়াই, নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় মিহির গুপ্তের পৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র চাপড় দিয়া কহিলেন "বেশ তো! তুমি কখন এখানে এলে ? তোমাকে তো এতক্ষণ দেখতে পাইনি! আজ দুই তিন দিন থেকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমরা হাল্লাক।"

মিহির। কেন? ব্যাপার কি?

অমর। ভয়ে বল্‌বো, না নির্ভয়ে বল্‌বো?

মিহির। কেন আমি বাঘ না ভালুক—যে ভয়?

অমর। বাঘও নও, ভালুকও নও! কুনো ব্যাং। যা হ'ক্! তোমাকে আমার এই বিশিষ্টা রমণী বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ইনি তক্ষশিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক্ ধনপতির একমাত্র কন্যা চিত্রা। আর উনি ইঁহার জননী।

এক মুহূর্ত্তের জন্য মিহিরগুপ্ত বজ্রাহতের ন্যায় নীরব হইয়া রহিলেন। পর মুহূর্ত্তে যেন যন্ত্র-চালিতের ন্যায় পুনরায় পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিলেন ও যন্ত্র-চালিতের ন্যায় কহিলেন "আপনাদের সহিত পরিচিত হইয়া

আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছি।”

চিত্রার মাতা কহিলেন, “আপনার স্বর্গগত পিতার সহিত চিত্রার পিতার বিশেষ আলাপ ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে কার্য্যোপ-লক্ষে যখন তক্ষশিলায় যেতেন তখন আমাদের ওখানেই গিয়ে থাক্‌তেন। চিত্রাকে তাঁর পুত্রবধূ কর্‌বেন বড়ই সাধ ছিল।”

এই কথা শুনিয়া চিত্রা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।

মিহিরগুপ্ত কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই, ভাস্করাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা এরূপ অপ্রত্যাশিত আকস্মিকভাবে সপ্রমাণিত হইতে দেখিয়া, বিস্মিতভাবে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভাস্করাচার্য্যের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, ভাস্করাচার্য্য তখন কোথায়? তিনি তখন তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

চিত্রা সলজ্জ দৃষ্টিতে মিহিরগুপ্তের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, "যাহার সঙ্গে আপনি কথা কহিতেছিলেন, সেই লোকটি কে? লোকটির চেহারা যেমন অসাধারণ, তেমনই ভয়ঙ্কর—বিশেষতঃ চোখ দুটি।"

চিত্রার কথা শুনিয়া মিহিরগুপ্ত ঈষৎ হাসিলেন।

অমরগুপ্ত কহিলেন, "কে! ভাস্করাচার্য্য! বাস্তবিকই, লোকটি অসাধারণ! কি আশ্চর্য্য! আমাদের সঙ্গে এতদিনের আলাপ, তবু যাবার সময় একটু বলেও গেল না।"

মিহিরগুপ্ত বলিলেন, "লোকটা রাতদিন নিজের খেয়ালেই চলে।"

উৎসুকভাবে চিত্রা কহিল, "লোকটা কে

তা আপনারা কিছুতেই ভেঙ্গে বল্‌বেন না। কেবল বল্‌ছেন লোকটা অসাধারণ, লোকটা এক রকম।"

মিহিরগুপ্ত কহিলেন, "লোকটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান্‌লে ত' বল্‌বো। আমি এই টুকু মাত্র জানি যে উনি একজন সংসার-বিরাগী যোগী। ওঁর ধর্ম্মমত নিরীশ্বরবাদ। উনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও তার্কিক। উঁহার জ্যোতিষের জ্ঞান অদ্ভুত। মুখ দেখিয়াই উনি লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলিয়া দিতে পারেন।"

চিত্রার মাতা কহিলেন, "ওঃ—তা হলে লোকটা গণৎকার।"

মিহির। না। ঠিক ব্যবসায়ী গণৎকারও নন্।

চিত্রা। হাত দেখে আমিও অমন দু-চারটে গণনা করে দিতে পারি।

মিহির। ভাস্করাচার্য্য কেবল চেহারা দেখেই এমনভাবে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, যার অনেক কথা একেবারে ঠিক্‌ঠাক্‌ মেলে।

চিত্রা। বেশ এইবার দেখা হ'লে আমি আমার ভবিষ্যৎটা ওঁর কাছ থেকে গণিয়ে নেব। কিন্তু লোকটার যে কড়া চাহনি! ওঁর চোখ দেখ্‌লেই ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠে।

চিত্রার মাতা। চিত্রার আমাদের ঐ এক কেমন মিছে ভয়। কেন লোকটার চাহনি এমন খারাপই বা কি ?

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা গিয়া নিজ নিজ যানে আরোহণ করিলেন।

প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে স্ত্রীপুরুষে একস্থানে

বসিয়া অভিনয় দর্শন করিতেছে, পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেছে, ইহা বোধ হয় পাঠকের চক্ষে একটু অসম্ভব ও দৃষ্টিকটু বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু পাঠক! মনে রাখিবেন আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ভারত সভ্যতার উচ্চতম শীর্ষে। বিক্রমাদিত্য, কণিষ্ক, অশোক, চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় নৃপতি তখন ভারতের রাজা। কালিদাস, শঙ্কু, বেতালভট্ট প্রভৃতি তখন ভারতের কবি। মনু, অত্রি, হারীত প্রভৃতি তখন ভারতের ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা। আত্রেয়ী, গার্গী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি তখন ভারতের গৌরব-রূপিণী রমণী। সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য, দর্শন সঙ্গীত চিত্র সর্ব্ববিধ কলানুশীলনে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের বাস্তবিকই তখন সত্যযুগ। ভারতের নৈতিক উন্নতি তখন চরমসীমায়। তখন অবরোধপ্রথার প্রয়োজনীয়তাও ছিল না, প্রচলনও ছিল না।

আমাদের এই আখ্যায়িকা সেই যুগের, সেই সমাজের। আধুনিক যুগের নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়া ভাস্করাচার্য্য বরাবর সিপ্রাতটস্থ প্রশস্ত রাজপথ বাহিয়া আপনার আবাসাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রজনী তখন দ্বিপ্রহরের অধিক। নগরী তখন সুষুপ্ত। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, নক্ষত্র-বধূরা হাসিতেছে। সিপ্রার স্বচ্ছ দর্পণে সেই হাসি প্রতিফলিত হইতেছে। নলিনীর নয়নের কোণে সেই হাসি উছলিয়া পড়িতেছে। ভাস্করাচার্য্য, তাঁহার উপাস্য দেবতা মহিমময়ী প্রকৃতির গৌরবান্বিত মুখচ্ছবি দেখিতে দেখিতে আনন্দে আত্মহারা

হইয়া আনমনে রাজপথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া আকাশ-পটে অঙ্কিত বিরাট কালপুরুষের মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ভাস্করাচার্য্য ভাবিতেছিলেন, "জগতের বেশীভাগ মানুষই কি গণ্ডমূর্খ, কি নির্ব্বোধের দল। তাহাদিগকে প্রতারিত করা কত সহজ। আভিজাত্যের অভিমানে অতিমাত্র স্ফীত, যথেচ্ছচারিতা, অপব্যয়িতা ও দুর্ব্বৃত্ততার প্রতিমূর্ত্তি, উচ্ছৃঙ্খল যুবা মিহিরগুপ্ত আমার ভবিষ্যৎ-বাণীর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণিত হ'তে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লো, আমাকে একজন অসাধারণ জ্ঞানী বলে ঠাউরে নিলে। দুয়ে-দুয়ে যোগ করিলে চার হয়, এ গণনায় ক্ষমতার কি পরিচয়! মিহিরগুপ্তের বিবাহসম্বন্ধে

ভবিষ্যৎ-গণনাও কি ঠিক সেইরূপ নয়? কোন লোকের চরিত্র, প্রবৃত্তি, কার্য্যকলাপ জানা থাকিলে, ঘটনার সহিত ঘটনার যোগ-বিয়োগে, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা ভুল হইবে কেন? এই মিহির-গুপ্তের বিবাহ-প্রশ্ন লইয়াই দেখা যাক্ না। দুই দিন মাত্র পূর্ব্বে আমি মিহিরগুপ্তের নিকট আত্মীয় অমরগুপ্তের মুখে তক্ষশিলার এই শ্রেষ্ঠী কন্যার কথা প্রথম শুনি। সেই দিনই, তাহার সহিত কথোপকথনে এরূপ আভাস পাই যে সে তাহার কোন নিকট আত্মীয়ের সহিত এই শ্রেষ্ঠী কন্যার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। আজ রাত্রে রঙ্গালয়ে, অমরগুপ্ত, চিত্রা, চিত্রার মাতা ও মিহিরগুপ্তের এই আকস্মিক সমবায় হইতে, ঘটনার যোগ বিয়োগে, আমি যে সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়াছি তাহা কি কদাচ ভ্রান্ত হইতে পারে? না, এ গণনা বড় একটা কঠিন জিনিষ ?—কিছুই নহে! একটু ভাবিয়া দেখিলে এরূপ ভবিষ্যৎ গণনায় সকলেই সক্ষম। কিন্তু, কি মূর্খতা মানুষের, সে এই সামান্য মাত্র মস্তিষ্ক চালনেও নারাজ।"

চলিতে চলিতে, ভাস্করাচার্য্য সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রি কত দেখিবার জন্য তাঁহার অঙ্গরাখার অভ্যন্তর হইতে একটি ঘড়ি বাহির করিলেন। ঘড়িটির গঠন অথবা উপাদান সাধারণ ঘড়ির ন্যায় নহে। যে ধাতুতে ইহা গঠিত তাহা অনেকটা সুবর্ণের মত হইলেও, সুবর্ণ অপেক্ষা বহুগুণে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান্। পতঙ্গ, যেমন দীপশিখার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া গিয়া

তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, একটি চোরও সেইরূপ অতর্কিতে ভাস্করাচার্য্যের পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে ঘড়িটি ছিনাইয়া লইল। ঘড়িটি চোরের হস্তে স্পৃষ্ট হইবামাত্র একটি তড়িৎ স্রোত তাহার শরীরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার স্নায়ুপেশীগুলিকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। চোর হতবুদ্ধি হইয়া হাত ঝাড়িয়া ঘড়িটি ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু শক্তিশালী চুম্বক যেমন জোরে লৌহকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে ঘড়িটিও তাহার হস্তে সেইরূপ সংলগ্ন হইয়া রহিল। চোর একটি বিকট চীৎকার করিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আর এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিল না।

ভাস্করাচার্য্য তাহার দিকে চাহিয়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈষদ্ধাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু! কেন একাজ করিতে আসিয়াছিলে?"

চোর ত্রস্তভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার হাত তখন অসাড়। ঘড়িটি তাহার হাতে তখনও দৃঢ়সংলগ্ন।

ভাস্করাচার্য্য হাসিতে হাসিতে চোরের নিকটে গিয়া, আস্তে আস্তে তাহার হাত হইতে ঘড়িটি খুলিয়া লইয়া নিজের আঙ্‌রাখার পকেটে রাখিলেন। চোরের হস্ত শ্লথ ও শক্তিহীন হইয়া ঝুলিতে লাগিল।

ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, "বন্ধু! ঘড়িটি তুমি লইয়া যে বড় লাভবান্ হইতে তাহা বোধ হয় না। উটি তোমার অনেক অসুবিধার কারণ হইত। চোরাই মাল

অনেক সময় তাহাই হয়। তুমি কিছু ভয় পাইয়াছ দেখিতেছি। হস্তের পেশীগুলি তোমার আঘাত পাইয়াছে মাত্র—বেশী কিছুই হয় নাই। কিন্তু সাবধান! বুঝিয়া স্থঝিয়া লোকের গায়ে হস্তস্পর্শ করিও। এই সভ্যতার যুগে, অনেক তড়িন্ময় যন্ত্রের কথা বোধ হয় শুনিয়াছ।

রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে চোর কহিল, "তাহ'লে কি না খেয়ে মর্‌বো না কি?"

ভাস্করা। বন্ধু! মিথ্যা কথা ব'লে কেন আরও পাপের বোঝা ভারী কর্‌ছ। না খেতে পেলে কি অমন নাদুস্‌-নুদুস্‌ দেহ থাকে? চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রীতিমত তোমার চলে, তা' আমি বেশ জানি। বন্ধু! তুমি পেটের দায়ে চোর

নও। চুরি তোমার ব্যবসা। যাক্! বোধ হয় এখন অনেকটা আরাম বোধ ক'চ্ছ। এখন এস। রাত্রি ঢের হয়েছে।

এই বলিয়া ভাস্করাচার্য্য ধীরে ধীরে তাঁহার গন্তব্যপথে চলিতে লাগিলেন। চোরও নিস্ফল ক্রোধে গর্‌গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ভাস্করাচার্য্য আপন মনে বলিতে লাগিলেন—মূর্খ! নিরেট বোকার দল! চোরে চুরি করে। নরহন্তা হত্যা করে, চাষা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। নরনারী খায়, বেড়ায়, পাশব বৃত্তি পরিতৃপ্ত করে। কেন? কি উদ্দেশ্যে? সৃষ্টি কিম্বা প্রলয়? জীবন অথবা মরণ? স্বর্গ না নরক? জ্ঞান অথবা মোহ? দয়া না নিষ্ঠুরতা?

লীলার স্বপ্ন

ঈশ্বর না শয়তান? কোন্‌টা ঠিক? কোন্‌টা সত্য? জগৎ! তোমার অন্তর্নিহিত সত্য কি আমি জান্‌বো, কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিপ্রাতটে একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন উদ্যান-বাটিকায় ভাস্করাচার্য্যের আবাস। আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া ভাস্করাচার্য্য বরাবর নিজের কক্ষে গেলেন। রজত-নির্ম্মিত দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছিল। সমস্ত ঘর জুড়িয়া একখানি পরিষ্কৃত গালিচা পাতা। তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একখানি অজিন আস্তৃত। দেয়ালের গায়ে তাকে স্তরে স্তরে সজ্জিত কেবল পুঁথি ও পুরাতন কীটদষ্ট পুস্তকাদি। ঐ মৃগচর্ম্মের আসনে বসিয়া ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সমীপস্থ একরাশ চিঠির

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—আপন মনে কহিলেন, "আজ আর চিঠিগুলি খুলিবার অবসর আমার নাই। কি আশ্চর্য্য! মানুষের একটু মৌলিকত্ব দেখিলেই, সংসারের লোক, তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ত্যক্ত করিয়া তুলে। আমি একজন অতি সামান্য নগণ্য লোক। কত রাজা-রাজড়া আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত! কেন? আমি তো তাহাদিগকে তোষামোদ করি না, তাহাদের অনুগ্রহপ্রার্থীও নহি। তবে কেন তারা আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত? তার কারণ হচ্ছে আমার মস্তিষ্ক।"

ভাস্করাচার্য্য সহসা দীপের দিকে চাহিলেন। সংযতভাবে একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াই রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একজন যুবক দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবকের আকৃতি রতিপতির ন্যায় চিত্তবিমোহন। তাহার বয়স একুশ বাইশ।

ভাস্করা। প্রদ্যুম্ন! তুমি আমার আহ্বান শুন্‌তে পেয়েছ?

প্রদ্যুম্ন। তা না হ'লে কি ক'রে জান্‌তে পার্‌লাম, গুরুদেব! যে আপনি বাড়ী ফিরে এসেছেন? গুরু! আপনার এত রাত্রি হ'ল কেন? আমার যে বড় ভয় কচ্ছিল।

ভাস্করা। বালক! ভয় কিসের?

প্রদ্যুম্ন। তা' জানি না, গুরুদেব! তবে আপনি না থাক্‌লে, এ বাড়ীতে একা আমার কেমন ভয় ভয় করে।

ভাস্করা। কোনও ভয় নাই। তুমি আহারাদি করেছ?

প্রদ্যুম্ন। আজ্ঞে হাঁ, গুরুদেব!

ভাস্করা। কৃত্তিকা ?

প্রদ্যুম্ন। কৃত্তিকা আহার করেছে। তবে, তার মেজাজটা আজ যেন একটু খারাপ দেখ্‌লাম। বড় কথাবার্ত্তা কইলে না। খেয়েই গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

ভাস্করা। যাও, প্রদ্যুম্ন! রাত্রি অনেক হ'য়েছে। তুমিও শোও গে।

প্রদ্যুম্ন প্রস্থান করিল। ভাস্করাচার্য্য ভাবিতে লাগিলেন কৃত্তিকার মন খারাপের কারণ কি? প্রদ্যুম্ন, কৃত্তিকা, লীলা এই তিন জনের কাহারও তো আমার ইচ্ছাশক্তি ছাড়া, স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তবে কেন আমার এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির মধ্য দিয়ে, তাহাদের স্বাতন্ত্র্য মাঝে মাঝে উঁকি মারে? ইহার কারণ কি আমাকে এখনি তা দেখ্‌তে হলো।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই কথা বলিয়া ভাস্করাচার্য্য ত্রিতলে উঠিয়া গিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষে তখনও দীপ জ্বলিতেছিল। এক পার্শ্বে, পর্য্যঙ্কে একজন বর্ষীয়সী রমণী নিদ্রা যাইতেছিল। ভাস্করাচার্য্য প্রবেশ করিবা মাত্রই রমণী নিদ্রোত্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার সমীপে দাঁড়াইল। অদূরে ভিত্তিগাত্রে একখানি প্রস্তর-ফলক ও একটা লেখনী ঝুলিতেছিল। ভাস্করাচার্য্য সেইখানি লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন ও রমণীকে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন।

ভাস্করাচার্য্য লিখিলেন, "আজ, কোন পরিবর্ত্তন কি লক্ষ্য করিয়াছ?"

কৃত্তিকা। কিছুই না।

ভাস্করা। নড়ে চড়ে নাই?

কৃত্তিকা। একেবারেই না।

ভাস্করা। তোমার মনটা আজ এত ভার ভার কেন ?

কৃত্তিকা। আমার আবার মন কি ? ক্রীতদাসীর আবার মন কি ?

ভাস্করা। আমার ধারণা ছিল,- তোমার এ দাসত্বে তুমি অসুখী নও। কৃত্তিকা! লীলার পরিচর্য্যা করায় কি তুমি সুখ অনুভব কর না ? লীলাকে কি তুমি ভালবাস না ?

কৃত্তিকা। পাথরের মূর্ত্তি কিম্বা কাপড়ে আঁকা পটকে ভালবেসে লাভ কি ? ভালবাসা আদান-প্রদানে। জড়ের সঙ্গে মানুষের ভালবাসা কেমন করিয়া সম্ভবে ? ভালবাসা! আমি ভালবাস্‌তে জানিনি ? বেশ জানি। কিন্তু কি কর্‌ব ? আমাদের

হৃদয়ের কবাটের চাবি, আপনার হাতে।

ভাস্করা। রাত্রি অনেক হইয়াছে, কৃত্তিকা! তুমি শোও গিয়া, আমি একবার লীলাকে দেখিয়া আসি।”

কৃত্তিকা নিঃশব্দপাদসঞ্চারে গিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিল। ভাস্করাচার্য্য কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রবল তড়িচ্ছক্তিপূর্ণ নয়নের দৃষ্টি প্রৌঢ়া বিগতযৌবনা কৃত্তিকার দিকে লগ্ন করিয়া মনে মনে কহিলেন— রমণি! তুমি বিধবা ও সংসারে একাকিনী। তুমি বধির। আমার ইচ্ছাশক্তির বলে তুমি এখনি নিদ্রাগত হও! অতীতের সহস্র সোনালি স্বপ্ন তোমার হৃদয়ে ফুটে উঠুক্। তোমার যৌবন ফিরে আসুক্। তোমার বধিরতা দূর হ'ক্।

এই কথা বলিয়া, ভাস্করাচার্য্য সেই কক্ষের ভিত্তি-সংলগ্ন একটি সবুজ মখমলের পর্দ্দা সরাইয়া ফেলিলেন। যবনিকার অন্তরালে যেন অমরার ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইল।

একখানি মূল্যবান্ মেহগনি কাষ্ঠ নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে, সুবর্ণতন্তুবিজড়িত ঝালর যুক্ত কিংখাপের গদীর উপর, কৌষেয় বসনের মসৃণ আস্তরণ। দুইটি সুকোমল মখমলের উপাধান। সেই পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছে একজন ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী। যুবতী তন্বী, গৌরাঙ্গী। তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ আলুলায়িত অলকা যেন শিরোদেশে প্রাবৃটের জলদমালা রচনা করিয়াছে। অপরিসর ললাটে মুক্তাফলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। তাহার উপর দুই একটি চূর্ণকুন্তলের গুচ্ছ

আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার গণ্ডযুগলে বসরাই গোলাপের অরুণিমা। ঠোঁট দুখানি পাতলা ও পক্ক বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ। অধরোষ্ঠ ঈষৎ ভিন্ন হওয়ায় তাহার মৌক্তিক দশন গুলি অল্প দেখা যাইতেছিল। রমণীর গলায় একটী বহুমূল্য মুক্তার হার; তাহার মধ্যস্থলে একখানি পদক। এই পদক খানি অষ্ট-ধাতুমিলিত ও নবরত্নখচিত। ইহার মধ্যস্থলে একখানি বহুমূল্য চূণী। লীলার দক্ষিণ হস্ত এই মণিখানির উপরে ন্যস্ত থাকে। এক কথায় রমণী পরমা সুন্দরী।

ভাস্করাচার্য্য অতি সন্তর্পণে গিয়া পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে বসিলেন। তড়িদ্বহ সূত্রের সংযোগ মাত্রেই যেমন বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠে, ভাস্করাচার্য্য পালঙ্কে উপবেশন

করিবা মাত্র সেইরূপ লীলার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভাস্করাচার্য্য কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রমণীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল; তাহার বামহস্ত খানি নিজের হস্তে লইয়া তাহার মণিবন্ধ দুই অঙ্গুলি দ্বারা একটু চাপিয়া ধরিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন, "লীলা! লীলা! তুমি কোথায়?"

"এই যে আমি এই খানেই।"

"তুমি বেশ ভাল আছ?"

"হাঁ! বেশ আছি।"

"লীলা! তুমি এখন কি কি জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

"অসাধারণ সৌন্দর্য্য। অনন্ত সুষমা! অফুরন্ত আলো! কিন্তু কই তোমাকে ত' সেথায় দেখ্‌ছি না! কেবল তোমার গলার স্বর শুন্‌তে পাচ্ছি। তোমার আওয়াজ

শুন্‌লে আমার আর থাক্‌বার যো নাই। আমাকে তোমার কাছে আস্‌তেই হবে।”

“আস্‌তে হবে? তাহলে তুমি এখানে সর্ব্বক্ষণ থাক না? কোথায় থাক?”

“মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত সৌন্দর্য্য হ’তে সৌন্দর্য্যান্তরে, নক্ষত্র হ’তে নক্ষত্রান্তরে ঘুরে বেড়াই।”

“সেখানে কি দেখ্‌তে পাও?”

“কোথাও দেখি ব্যোমস্পর্শী তুষার কিরীটী অদ্রিমালা। কোথাও দেখি অনন্তবিস্তৃত জলোচ্ছাসময় মহোর্ম্মি। কোথাও দেখি সিংহব্যাঘ্রাদিসেবিত ভীষণ অরণ্যানী। কোথাও দেখি শ্যামল শাদ্বল শষ্প বিলসিত ক্ষেত্র। কেবল শোভা! কেবল সুষমা! কেবল আনন্দ! সে

শোভার পরিমাণ নাই। সে আনন্দের শেষ নাই।"

"কোথাও দুঃখ, জরা, মৃত্যু দেখ্‌লে না?"

"না!"

"আবার যাও! ব্যোম ভেদ করে, অনন্তশূন্যের মধ্য দিয়ে ওই দীপ্তিমান্ আলোক পিণ্ডে প্রবেশ কর গিয়ে। মঙ্গল গ্রহের সকল স্থান তন্ন তন্ন অন্বেষণ করে আমার নিকট ফিরে এস।"

"যে আজ্ঞা।"

ভাস্করাচার্য্য কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে লীলার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। লীলার মুখে সুষুপ্তির শান্তি বিরাজিত।

ভাস্করাচার্য্য ডাকিলেন, "লীলা! এসেছ?"

"হাঁ!"

"কি দেখ্‌লে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"কই, দুঃখ, জরা, মৃত্যু তো কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না। তুমি কে? তুমি কেন আমাকে, যা নেই তারই নিষ্ফল অন্বেষণে পাঠাও? আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাই না। শুধু তোমার কথা শুনি। তোমার আজ্ঞা পালন করি।"

"মৃত্যুর সন্ধান পেলে না? দুঃখ জরা দেখ্‌তে পেলে না? সত্য?"

"মিথ্যা কেন বল্‌বো?"

"মৃত্যু এখানেও নাই?"

"না—এখানকার ভাষায় যাকে মৃত্যু বলে, সেটা মৃত্যু নয়, জীবন। নির্ব্বাণ নয়, পরিবর্ত্তন।"

"তুমি স্বপ্ন দেখ্‌ছো, লীলা?"

"কেন দেখাচ্ছ? আমায় ছেড়ে দাও না! আমি চলে যাই! আমি তো এখানে আস্‌তে

চাইনি। কেন আমাকে তবু ডেকে আন ?”

লীলার মুখে যেন একটু অভিমানের ছায়া ফুটিল। তাহার মুখের একটু ভাব পরিবর্ত্তন হইল।

ভাস্করাচার্য্য ডাকিলেন, “লীলা।”

লীলা নিরুত্তর।

ভাস্করাচার্য্য আবার ডাকিলেন, “লীলা !”

কোন উত্তর পাইলেন না। আপনার মনে কহিলেন, “চলিয়া গিয়াছে।” ভাস্করাচার্য্য আস্তে আস্তে লীলার হস্ত দুইখানি তাহার বুকের উপরে, কণ্ঠহারে পদকের মধ্যমণিটি স্পর্শ করাইয়া রাখিয়া, ধীরে ধীরে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত প্রস্তর ফলকে লিখিয়া রাখিয়া গেলেন—“আমি দুই দিনের জন্য, স্থানান্তরে যাইব। এই দুই দিনই দিনের

বেলা সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিবে, যেন যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস ও সূর্য্যালোক গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। ঘরে বেশী গোলমাল করিবে না। ভুলিয়াও তাহাকে স্পর্শ করিবে না।”

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরজন্ম একটা কথার কথা। মানুষ ম'রে গেলে আবার ফিরে আসে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। এইখানেই স্বর্গ, এইখানেই নরক। খাও, দাও, স্ফূর্ত্তি কর —ইহাই সার নীতি।

বক্তা একজন প্রৌঢ় বয়স্ক তান্ত্রিক বৌদ্ধ। তাহার দেহ হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তে অক্ষ বলয়। কপালে রক্ত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক।

ভাস্করাচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারই

লিখিত এই পত্রখানি। আপনি একটি বৌদ্ধ বিহারের পরিচালক।"

"আপনার অনুমান ঠিক।"

"বিহারের অপরাপর ভিক্ষুগণের সহিত আপনার সদ্ভাব নাই।"

"হাঁ!—না!—ঠিক সদ্ভাব—তা বটে তবে বিশেষ ঝগড়াও নাই।"

"আপনি কি জানিতে চাহেন?"

"আপনি জ্যোতিষী। আপনিই বলুন, আমি কি চাই।"

"তাহা বড় আপনার শ্রুতি-সুখকর হইবে না।"

"সে ভাবনায় আপনার প্রয়োজন নাই। আপনি বলুন্ না শুনি।"

"কোন বিবাহিতা রমণীর প্রতি আপনি আসক্ত।"

"মিথ্যা কথা!"

আমার কথা মিথ্যা! হতভাগ্য মানব! তোমার সমস্ত জীবনটা কতকগুলি বিরাট মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় রচিত। আর তোমার মুখে চোখে প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে তাই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। মূর্খ! যে অনন্ত শক্তি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে পরিগণিত করছে, তুমি সেই শক্তিকে প্রতারিত করতে চাও! কি ধৃষ্টতা! আরও শুন—তুমি "সেই রমণীকে লাভ করিবার জন্য তন্ত্র শাস্ত্রানুসারে নানা প্রকারের অভিচারও আরম্ভ করিয়াছ।"

"এ কথাও ঠিক নহে।"

"ঠিক কি বেঠিক তাহা তুমি নিজেই ভাল জান। সময় থাক্‌তে সাবধান হও—স্থির জানিও এই রমণীই আপনাকে হত্যা করিবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সহসা এই প্রচ্ছন্নাচার তান্ত্রিক বৌদ্ধের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। ভীতি-বিজড়িত স্বরে সে কহিল "আপনার অনুমান ঠিক। তবে কথাটা যেন আপনি প্রকাশ করিবেন না।"

ভাস্করাচার্য্য উত্তর দিলেন "আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। আর অর্দ্ধ প্রহর পরে, আপনার সহিত দেখা হইলে, আপনাকে চিনিতে পারি কিনা, বলিতে পারি না।"

তান্ত্রিক আর কিছু না বলিয়া, ধীরে ধীরে, এক-পা দুই-পা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময়, ক্রোধে ঈর্ষ্যায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ও—কি দাম্ভিকতা! কি অহঙ্কার! ভৈরবী! দর্পচূর্ণ কর।"

ভাস্করাচার্য্য একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই প্রদ্যুম্ন আসিয়া ভাস্করাচার্য্যকে নমস্কার করিল ও তাঁহাকে বহির্গমনোপযোগী বেশে সজ্জিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "আপনি এখন বাহিরে যাইবেন না কি ?"

ভাস্করা। হাঁ প্রদ্যুম্ন! আমি দুই দিনের জন্য একটু স্থানান্তরে যাইব।

প্রদ্যুম্ন। কত দূর ?

ভাস্করা। রঘুজীপন্থের আশ্রমে।

প্রদ্যুম্ন। কে ? পাগ্‌লা রঘুজী ?

ভাস্করা। তোমার অনুমান ঠিক। তবে পাগল এ সংসারে একা রঘুজীই নয়। আমিও পাগল, তুমিও পাগল। যার যেটা ঝোঁক্। যার যেমন খেয়াল। রঘুজীর খেয়াল, বিজ্ঞান বলে সৌদামিনীকে আজ্ঞানু-বর্ত্তিনী করে, তাহার বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টা যত্ন ও

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরিশ্রমের ফলে রচিত শিলাচক্রে বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ হইতে আলোকরশ্মি সমানীত ও কেন্দ্রীভূত করে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। তাতে তার অপরাধ?

প্রদ্যুম্ন। আমায় ক্ষমা কর, ভাই! রঘুজীকে পাগল বল্লে যে তুমি রুষ্ট হবে, তা আমি ভাবি নি।

ভাস্করা। না ভাই! আমি তোমার উপর রুষ্ট হই নাই। তবে তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি, যে সংসারে যখন সকলেই পাগল তখন পাগ্‌লামিটা উপহসনীয় নয়। যাহা হউক, শিবিকা প্রস্তুত, আমি চলিলাম। তোমরা সাবধানে থাকিও। অনর্থক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, নিয়তির হস্তাঙ্কিত সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, ইচ্ছা করিয়া দুঃখের বোঝা নিজের স্কন্ধে টানিয়া আনিও না।

ভাস্করাচার্য্য প্রস্থান করিলে পর, প্রদ্যুম্ন একটু বিষণ্ণভাবে কক্ষে পাদচারণা করিতে লাগিল। তাহার যেন কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সহসা গালিচার উপরে নজর পড়ায় প্রদ্যুম্ন দেখিল একখানি হস্ত লিখিত পুরাতন পুঁথি ভাস্করাচার্য্যের আসনের সন্নিকটে খোলা রহিয়াছে। তিনি যেন, সেইখানি পড়িতে পড়িতে, অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া গিয়াছেন। পুঁথি খানি তুলিয়া রাখিয়া যাইতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

প্রদ্যুম্ন সেই খানে, গিয়া বসিলেন। পুঁথি খানির যে খানে খোলা আছে, সেই খানটা পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুস্তকখানির ভাষা যদিও সংস্কৃত, কিন্তু তাহা এত প্রাচীন যে প্রদ্যুম্ন সকল কথার অর্থোপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর একটি সমস্যা তাহাকে বড়ই চিন্তিত করিয়া তুলিল। প্রত্যয় পুস্তকখানি পাঠের জন্য নিকটে লইতেই যেন তাহার লেখাগুলি অস্পষ্ট ও পরস্পর জড়িত হইয়া আসে। আবার যখনই পুস্তকখানি রাখিয়া দেন তখনই লেখাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি বিস্মিত হইয়া পুস্তকখানি লইয়া জানালার নিকট গেলেন। নবোদিত সূর্য্যের পরিপূর্ণ আলোকে পুস্তকখানির যে অংশ খোলা ছিল সেই অংশ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা আছে "জ্ঞান, অনুভূতি, প্রীতি, ঘৃণা, ঈর্ষা, হিংসা, জিঘাংসা প্রভৃতি উৎকট মনোবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে কথা হইতেছে এই, যে তাহাদিগকে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে, এক আত্মা হইতে অপর আত্মায় সংক্রামিত করা যাইতে পারে। ইহা

যোগের একটি অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দুইটি প্রক্রিয়া দ্বারা এই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়। প্রথমতঃ, যাহার আত্মায় ঐরূপ কোনও বৃত্তি সংক্রামিত করিতে হইবে, তাহাকে অন্তর্নিহিত চৌম্বক শক্তি দ্বারা প্রাণিত কোন উজ্জ্বল বস্তুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রাখিতে হইবে। অথবা, প্রবলতর ইচ্ছাশক্তিবলে তোমার চক্ষুর্দ্বয়কেই একটি চুম্বকে পরিণত করিয়া, যাহার আত্মায় তোমার ইচ্ছাশক্তিমত প্রবৃত্তি সংক্রামিত করিতে হইবে, তাহার চক্ষুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা। এত-দুভয়বিধ প্রক্রিয়া দ্বারাই তাহার চক্ষুর্দ্বয়ের স্নায়ুমণ্ডলী জড় ও নিষ্ক্রিয় হইয়া আসিবে। তখন তাহার মস্তিষ্ক তোমার দ্বারা সংক্রামিত প্রবৃত্তিগুলিকে অতি স্পষ্টভাবে

প্রতিবিম্বিত ও তোমার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত করিবে। তখন সেই বশীভূত আত্মাকে, যাহা তুমি দেখাইতে চাও তাহাই দেখিবে, তুমি যাহা করাইতে চাও তাহাই করিবে। তুমি যাহা বলাইতে চাও তাহাই বলিবে। তাহার স্বাধীন সত্তা আর কিছুই থাকিবে না।”

পুস্তকের এই কয়েকটী ছত্র পাঠ করিয়াই প্রদ্যুম্নের শরীর ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল! সে মনে করিল “তবে কি আমি যে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছি, যে প্রাণোন্মাদকর সঙ্গীত সুধারসে নিরন্তর ডুবে আছি, সে সমস্তই ভাস্করাচার্য্যের অতি প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সংক্রামিত? তবে কি আমার আত্মার কোন স্বাধীন সত্তা নাই? তবে কি সত্যই আমি কি ভাস্করা-

চার্য্যের প্রবল চৌম্বক-শক্তির অনুবর্ত্তী হয়ে জড়ের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ কর্‌ছি? সেই জন্যই কি প্রগাঢ় সুষুপ্তির মধ্যেও, তার আহ্বান আমার কাণে প্রবেশ করে। কি জানি কি অজানিত আকর্ষণে আমাকে তখনই তার পানে টেনে নেয়।"

প্রদ্যুম্ন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আকুল-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। দারুণ চিন্তায়, সে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল। মুক্ত বাতায়নপথে কক্ষে পতিত নবোদিত হেমোজ্জ্বল সূর্য্যকর তাহার নিকট নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সহসা কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধদেশে হস্ত স্পর্শ করিল। প্রদ্যুম্ন চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল—কৃত্তিকা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কৃত্তিকার মুখের ভাব আজ যেন একটু বিশেষ পরিবর্ত্তিত। তাহার বার্দ্ধক্যশীর্ণ মুখে আজ যেন যৌবনের চাপল্য। তাহার কুঞ্চিত নয়নকোণে হাসির সৌদামিনী রেখা। আজ তাহার মুখ গাম্ভীর্য্যের ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন নহে। আজ সে বড় মুখরা।

প্রদ্যুম্নের কাণের কাছে মুখ লইয়া কৃত্তিকা জিজ্ঞাসিল, "গুরুদেব বেরিয়ে গিয়েছেন ?"

অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রদ্যুম্ন উত্তর দিল,—"হাঁ।"

কৃত্তিকা। কোথায়? শীঘ্র ফির্‌বেন না কি?

প্রদ্যুম্ন। দুই দিন পরে।

কৃত্তিকা। বেশ হয়েছে। আজ রাত্রে তা'হলে নিশ্চয়ই আস্‌বে না। লোকটা হয় দেবতা, না হয় ভূত। তবে, আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছে। আমাকে মরণের গ্রাস হ'তে কেড়ে নিয়ে এসেছে। প্রদ্যুম্ন, তুমি কি আমায় বৃদ্ধা জরাগ্রস্তা ব'লে ঘৃণা কর? হা! হা! তা করো না। আমিও একদিন যুবতী ছিলাম। আমারও স্বামী ছিল। আমাকে কত ভালবাসতো! আমি স্বপ্নে কাল সব দেখেছি। গুরুর কৃপায় কাল বড় আনন্দ লাভ করেছি।

প্রদ্যুম্ন। কৃত্তিকা, তুমি পাগল হলে না কি? কি আবোল-তাবোল বক্‌ছ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কৃত্তিকা। আমি পাগল, না পাগল তুমি, প্রদ্যুম্ন? আমি স্ত্রীলোক। আমি বৃদ্ধা। আমার সংসারে কেউ নেই। আমার আর ভোগের সময় নাই। স্পৃহা আছে, কিন্তু শক্তি নাই, সুবিধা নাই। তুমি কি, প্রদ্যুম্ন? তোমার যৌবন-মসৃণ দেহ হ'তে নিরূপম লাবণ্য ক্ষরিত হচ্ছে। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসে সদ্য প্রস্ফুটিত কুমুদিনীর সৌরভ। তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল মদনের রঙ্গভূমি। তোমার ভ্রূভঙ্গে কুসুমায়ুধের বিমোহন চাপের ভঙ্গিমা। প্রদ্যুম্ন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে যৌবন যদি পেয়েছ, তবে উপভোগ করবে না কেন? জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ—রমণীর প্রেম। যাতে সেই অমূল্য জিনিস পাও, এস, প্রদ্যুম্ন, আমি তোমাকে সেই রাস্তা দেখিয়ে দিই।

প্রদ্যুম্ন। তুমি কি বল্‌ছ, কৃত্তিকা? আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনি।

কৃত্তিকা। তা পার্‌বে কেন? তুমি ত আর 'তুমি' নও। তুমি যে—'সে'। তাই ত তোমাকে বল্‌ছি আজ বেশ সুবিধা, আজ গুরু এখানে নেই, আজ আমি তোমার চোখ ফুটিয়ে দেবো। এসো, আমার সঙ্গে এসো।

প্রদ্যুম্ন। কোথায় যাব?

কৃত্তিকা। ত্রিতলে ঐ ঘরে।

প্রদ্যুম্ন। ও ঘরের দিকে চাইতেও গুরুর নিষেধ।

কৃত্তিকা। তা জানি, গুরুর নিষেধ কেন, জান? ভয়ে, ঈর্ষ্যায়। প্রদ্যুম্ন, পাছে তোমার ভুবন-বিমোহন রূপ দেখে সে ভুলে যায়, সেই জন্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রদ্যুম্ন। কে?

কৃত্তিকা। কে?—নিজের চোখে তাকে দেখ্‌বে এসো।

কৃত্তিকার রহস্যপূর্ণ কথায় প্রদ্যুম্নের মন যৎপরোনাস্তি আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, "গুরু বলেন, সমস্তই নিয়তি। বাস্তবিক কি তাই? পুরুষকারের বলে কি নিয়তি খণ্ডিত হয় না? স্বাধীন প্রবৃত্তি কি কিছুই নয়? কি করি? আমার হৃদয়ে বিষম কৌতূহল হচ্ছে। প্রলোভনকে পদাঘাতে দূরীভূত করি, কি এই রহস্যের উদ্ঘাটনের জন্য গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করি? কি করি, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

ভাস্করাচার্য্য প্রস্থানকালে তাহাকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন সেই কথা বারবার

তাহার মনে হইতে লাগিল—"অনর্থক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া নিয়তির হস্তাঙ্কিত সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, ইচ্ছা করিয়া দুঃখের বোঝা নিজের স্কন্ধে টানিয়া আনিও না।"

প্রদ্যুম্নের সমস্ত দিন এই চিন্তায় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উজ্জয়িনী হইতে কিছু দূরে সিপ্রাকূলে বিশাল অরণ্য ; তাহারই একদেশে লোকালয় হইতে বহুদূরে, একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, অট্টালিকার অনেকগুলি কক্ষই একেবারে বাসের অযোগ্য। দুই তিনটি কক্ষ মধ্যে মধ্যে জীর্ণ-সংস্কৃত হওয়ায় একটু পরিচ্ছন্ন। এই খানেই তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ রঘুজীপন্ত বাস করেন। রঘুজী সংসারে একক। তাঁহার পুত্র-কলত্রাদি সকলেই পরলোকে। একজন

মাত্র পুরাতন ভৃত্য লইয়া রঘুজী সংসারের কোলাহল হইতে বহুদূরে এই অটবীপ্রান্তে আসিয়া গণিত ও বিজ্ঞানের চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ভাস্করাচার্য্য ও তাঁহার পুরাতন ভৃত্য ভিন্ন সংসারে রঘুজী পন্থের অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধু ছিল না। তাই বিপদ-আপদ অভাব-অভিযোগের কারণ যদি কিছু হইত তবে ভাস্করাচার্য্যকেই তিনি তাহা জানাইতেন। ভাস্করাচার্য্য ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার আশ্রমের সন্ধান বড় একটা জানিত না। আর কেহ সেথায় আসিতও না।

ভাস্করাচার্য্য রঘুজীপন্থের আবাসে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন রঘুজীর ভৃত্য সান্ধ্য ধূপ দীপাদি দান কর্ম্মে ব্যস্ত রহিয়াছে। ভাস্করাচার্য্যকে দেখিয়াই সে দৌড়িয়া আসিয়া

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

ভাস্করাচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "রঘুজী কেমন আছেন" ?

ভৃত্য উত্তর করিল, "তাঁহার শরীর বড় দুর্ব্বল। না খেয়ে, না দেয়ে রাতদিন ব'য়ে মুখে থাক্‌লে আর কি বেশীদিন বাঁচবেন ? আপনি এসেছেন। আপনার পায়ে পড়ি, দাদাঠাকুর, দেখুন ব'লে ক'য়ে যদি চারটি খাওয়াতে পারেন। আপনারও বোধ হয় মধ্যাহ্নে খাওয়াদাওয়া হয় নি। আমি শীঘ্র শীঘ্র গিয়া পাকের যোগাড় করিয়া দিতেছি।"

ভাস্করা। মহাদেও! তোমার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আজ একাদশী, একাদশীর দিন আমি উপবাস করি।

ভৃত্য। ও—সত্যিই তো, দাদাঠাকুর, আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। বুড়ো হ'লে ঐরকম ভুল হ'য়ে যায়। তা' একটু দুধ ও কিছু ফলটলও খাবেন না ?

ভাস্করা। না, মহাদেও! কাল মধ্যাহ্নের জন্য পারণের ব্যবস্থাটা ভাল করিয়া কর গিয়া। এখন রঘুজী কোথায় তাই আমাকে বল।

ভৃত্য। তিনি আর কোথায় ? তাঁর সেই চিলের ঘরে।

ভাস্করা। আমি সেইখানে গিয়েই তা'হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

সোপানে ভাস্করাচার্য্যের পদশব্দ পাইয়া রঘুজী আহ্লাদে আটখানা হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন ও স্নেহগদ্গদস্বরে কহিলেন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"ভাস্কর! আমি তোমার পায়ের শব্দ শুনেই বুঝ্‌তে পেরেছি যে তুমি। তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ ভাস্কর। আর একটু দেরি হ'লেই হয় ত আর আমায় দেখ্‌তে পেতে না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা আছে। ঘরের মধ্যে এসো, সব একে একে বলি গিয়ে। আমার অন্তিম কাল সমাগত। আমি কিছুই সেরে যেতে পার্‌লাম না, ভাস্কর, সময় পেলাম না! বড় শীঘ্র শীঘ্র, কাজ সারা না হ'তে হ'তেই আমাকে যেতে হ'ল।"

ভাস্করা। না রঘুজী, তুমি কোন চিন্তা করিও না। তুমি মর্‌বে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তুমি একটু অবসন্ন ও ক্ষীণবল হয়েছ বটে। একটু বিশ্রাম, একটু

সুষুপ্তি আবার তোমাকে সুস্থ ক'রে তুল্‌বে। তোমার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত কর্‌বার জন্য যথেষ্ট সময় তুমি পাবে। আমি তোমার জীবিত কালকে প্রলম্বিত ক'রে দিব।

রঘুজীর মুখে একটু ম্লান হাসিরেখা দেখা দিল। ভাস্করাচার্য্যের কথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। ক্ষীণস্বরে রঘুজী কহিলেন, "সে কি সম্ভব, ভাস্কর? তুমি মানুষ। স্বয়ং ঈশ্বর যা কর্‌তে পারেন না, সে কার্য্য তুমি কেমন ক'রে কর্‌বে, আমি বুঝ্‌তে পারি না।"

অবিচলিত ভাবে ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, "কেমন ক'রে কর্‌ব, তা' তোমার চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিচ্ছি। তা' হ'লে তো প্রত্যয় হবে?" এই বলিয়া তিনি তাহার অঙ্গরাখার ভিতর হইতে একটি

স্ফটিকের শিশি বাহির করিলেন। শিশিটি একপ্রকার অতি উজ্জ্বল লোহিতবর্ণের তরল পদার্থে পূর্ণ। শিশির মুখে একটি বিচিত্রভাবে খোদিত সুবর্ণনির্ম্মিত ছিপি। এই স্ফটিকশিশির গায়ে দীপালোক প্রতিফলিত হইয়া সেই কক্ষমধ্যে যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রধনু রচনা করিল।

রঘুজী আশ্চর্য্যান্বিতভাবে সেইদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিশিতে কি ?"

ভাস্করা। অমৃত।

রঘু। উহার গুণ ?

ভাস্করা। মানবের দেহে, লুপ্ত জীবনী-শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা। শুনিয়াছি দেবতারা সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমিও এই সুধার প্রয়োগ

দ্বারা একটি মৃত ব্যক্তিকে ছয় বৎসর ধরিয়া জীবিত রাখিয়াছি। রঘুজী! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমিও যদি এই ঔষধ আমার উপদেশ মত সেবন কর, তাহা হইলে তোমাকে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত জীবিত রাখ্‌তে পার্‌বো। তার কোনও সন্দেহ নাই।

রঘু। অনন্ত কাল! তা হ'লে আমি অমর হয়ে থাক্‌বো। তা হ'লে আমার আরব্ধ কাজ সব সারা কর্‌তে পার্‌বো?

ভাস্করা। নিশ্চয়! অবশ্য যদি কোন অস্বাভাবিক মৃত্যু না তোমাকে কবলিত করে।

রঘু। তাহার অর্থ?

ভাস্করা। তাহার অর্থ, যদি অপঘাতে মৃত্যু না হয়। অপঘাত মৃত্যু প্রায়শঃ

নির্ব্বুদ্ধিতা, অপরিণামদর্শিতা ও অসম-সাহসের ফল, এবং মানুষের নিজের কর্ম্মফল।

রঘু। নৌকাডুবি হইয়া মরা, বজ্রাঘাতে মৃত্যু, এ সকলের উপর মানুষের হাত কি? ইহাতে মানুষের কি অপরাধ?

ভাস্করা। মানুষের দোষ নয়, তবে দোষ কাহার, রঘুজী? নৌকাডুবি হয় কেন? নৌকার গঠনের দোষে। সে দোষ কাহার? মানুষের ভ্রমাত্মক গণনার! আর বজ্রাঘাতে মৃত্যু! তাহাও মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল। মনুষ্য শরীর খাড়া ভাবে থাকিলে একটি প্রবল তড়িদ্বহ দণ্ডের কার্য্য করে। যে সময়ে আকাশে মেঘমণ্ডলে তাড়িতের আধিক্য বুঝা যায়, সেই সময় যদি মানুষ খাড়া না থাকিয়া, উত্তান অবস্থায় থাকে,

তাহা হইলে বজ্রাঘাতে মরণের ভয় একেবারেই থাকে না।

রঘু। ভাল! তোমার অমৃতের গুণ আমি অদ্যই পরীক্ষা কর্‌বো, ভাস্কর! কখন্ খেতে হবে?

ভাস্করা। শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে।

রঘু। আমার যে আদৌ নিদ্রা হয় না।

ভাস্করা। আজ হবে।

রঘু। উত্তম কথা! এখন চল! গত কয়েক মাসের কূট-দর্শন, অনুশীলন ও বিচারের ফলে আমার আলোক-যন্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেছি, দেখ্‌বে এস। আর কয়েক মাস হ'তে ইহার স্বচ্ছ দর্পণে কতকগুলি নূতন আলোক-রশ্মি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে দেখ্‌ছি। সে গুলি কোন্ গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু অথবা জ্যোতিষ্ক

হ'তে আস্‌ছে, তা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এস, ভাস্কর, তোমার প্রখর দূরদর্শনের ফলে, যদি এ রহস্যের কোন মীমাংসা করতে পার। আজ রাত্রিও বেশ পরিষ্কার। জ্যোতিষ্কপরিদর্শনের পক্ষে অতি প্রশস্ত সময়। এস, ভাস্কর, আর বৃথা সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধ রঘুজীপন্থ অগ্রে অগ্রে দীপ লইয়া চলিতে লাগিলেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তাঁহারা যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেই কক্ষটি নিতান্ত অপরিসর নহে। কক্ষের চারিধারে ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ মানচিত্র, নানা গ্রহ উপগ্রহ ভূমণ্ডল সূর্য্য চন্দ্র ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রতিমূর্ত্তি! কক্ষে অনেক গুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ জানালা, গবাক্ষ, ও আলোক আগম নির্গমের জন্য রন্ধ্র। দশ বারোটা বিভিন্ন গঠনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা প্রকারের ধাতব সূত্র ও ধাতব-রজ্জু। কোনওটি উর্ণানাভ তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম, কোনওটি পোতবন্ধন

রজ্জুর ন্যায় স্থূল। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একটি ক্রমসূক্ষ্ম সূচ্যগ্র নাতিস্থূল লৌহদণ্ড। সেই দণ্ডটির সূচীর ন্যায় মুখের উপরে একখানি প্রকাণ্ড স্থূল বৃত্তাকার স্ফটিক শিলা, শকটের চক্র যেমন অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরে, সেইরূপ ঘুরিতেছিল। পিতা যেমন প্রীতিপূর্ণ নয়নে তাহার সন্তানের মুখের পানে চাহে, উৎকর্ণ ভাবে তাহার আধ-আধ কথা শুনিয়া স্নেহরসে আপ্লুত হয়, রঘুজীও সেইরূপ এই ভ্রাম্যমাণ চক্রের পানে চাহিয়া রহিলেন, কাণ খাড়া করিয়া যে মধুর শব্দ হইতেছিল তাহাই শুনিতে লাগিলেন।

"পার্‌বো না? এ সমস্যার পূরণ কর্‌তে পার্‌বো না? আরে রে রাক্ষসি! তুই এ কথার মীমাংসা ক'রে দিতে পার্‌বি নি? তবে কি জন্য আমার আজন্ম

প্রাণপাত করা সাধনার বলে, তোর ওই অসাড় জড় শিলাময় দেহে প্রাণ সঞ্চারিত করলাম? কেন?” রঘুজী আপন মনে কহিতে লাগিলেন। পরে ভাস্করাচার্য্যের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “দেখ, ভাস্করাচার্য্য, একটি সূক্ষ্ম সূচীর অগ্রভাগে কত বড় গুরুভার শিলাখণ্ড ঘূর্ণিত হচ্ছে। ইহা কি বিস্ময়জনক আবিষ্কৃতি নহে?

ভাস্করাচার্য্য উত্তর করিলেন, “অবশ্য বিস্ময়জনক বটে! তবে, ব্রহ্মাণ্ডের এই জঙ্গমতা বহু কাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত সত্য।”

“সত্য! কিন্তু, সেই জঙ্গমতার জাজ্বল্য দৃষ্টান্তের আবিষ্কর্ত্তা বোধ হয় আমি। আর সেই দৃষ্টান্তের উপর নির্ভরতায় অনুমিত সত্য গুলিকেও তুমি ভ্রান্ত বলিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারিবে না।”

"সে সত্য কি, বল।"

"তাহার সর্ব্বপ্রধান সত্য এই যে, একটি মাত্র বিন্দুতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, একটি মাত্র বিন্দুর উপরে তাহার স্থিতি, ও একটি মাত্র বিন্দুতেই তার লয়।"

"সেই বিন্দুটির নাম কি?"

"ব্রহ্ম।"

"তোমার মতে ব্রহ্মই তাহা হইলে সৃষ্টির আদি। কিন্তু সেই আদিও কারণ ব্যতীত সম্ভবে না।"

"সেই কারণই আমি খুঁজিয়া অস্থির হইতেছি। পাইতেছি না। ভাস্কর, যদি আমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি তা হ'লে আমি কারণ খুঁজে বের কর্‌বই কর্‌ব।"

"কোনও ভয় করো না, রঘুজী! এই

ঔষধটি সেবন কর। তা হ'লে তোমার আয়ুকাল বর্দ্ধিত হবে। সুনিদ্রা হবে। ক্ষুধা হবে। কার্য্য কর্‌বার শক্তি লাভ কর্‌বে।"

"দাও, ভাস্করাচার্য্য। যা অদৃষ্টে থাকে আমি ঐ ঔষধই সেবন কর্‌বো। সবটাই খেতে হবে?"

"হাঁ!"

রঘুজী আর কালবিলম্ব না করিয়া, ভাস্করাচার্য্যের হস্ত হইতে ঔষধের শিশিটি লইয়া, তাহার সুবর্ণনির্ম্মিত ছিপিটি খুলিয়া, সমস্ত ঔষধটুকুই এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন। তাড়িৎশক্তির ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। রঘুজী হৃদয়ে একটা অপরিসীম আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অত্যল্প কাল

মধ্যেই মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহাকে আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া শয্যায় শায়িত করিয়া দিলেন ও তাঁহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন দেহের উত্তাপ ঠিকই আছে। শ্বাস প্রশ্বাসেও কোনওরূপ অস্বাভাবিকতা নাই। রঘুজী সুষুপ্তির অঙ্কে সুখশায়িত। তাঁহার মুখের ভাব প্রফুল্ল।

ভাস্করাচার্য্য মুক্ত বাতায়ন পথে একবার বাহিরের দিকে চাহিলেন—প্রকৃতির মুখে স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নার হাসি। তাঁহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল। সেই স্পন্দনের তালে তালে আকাশে নক্ষত্র-বধূগণেরও হৃদয় যেন স্পন্দিত হইতে লাগিল। ভাস্করাচার্য্য নির্ণিমেষে আকাশ পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি বিশাল এই রহস্য!

এ রহস্য মীমাংসা করে দেবে কে? লীলা! লীলাই এই অজ্ঞানতার তিমির মধ্যে জ্ঞানালোকরূপিণী।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন অতি প্রত্যুষেই রঘুজী নিদ্রোত্থিত হইয়া, তাঁহার দেহে এক অতি অসাধারণী জীবনীশক্তির সঞ্চার অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহার হৃদয় যৌবনের আশায় উৎসাহে পূর্ণ, যেন তাঁহার দেহে মত্ত হস্তীর বল। ভাস্করাচার্য্যও তাঁহার ঔষধের এই আশাতীত ফললাভে পরম প্রীত হইলেন। রঘুজী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে ভাস্করাচার্য্যের পানে চাহিয়া কহিলেন, "ভাস্কর! আমি তোমায় কি বলে আমার হৃদয়ের আনন্দ জানাবো, সে

ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নি! তুমি আমাকে মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এনেছ। তুমি আমার হৃদয়ে যৌবনের আশা ও উৎসাহের উৎস খুলে দিয়েছ। আমি বাঁচ্‌বো! আহা! আমি বাঁচ্‌বো। আমার কার্য্য সম্পূর্ণ কর্‌বার যথেষ্ট অবসর আমি পাবো। আজ এই প্রাতঃকালে উঠে আমি যেন নবজীবন পেয়েছি ব'লে বোধ হচ্ছে। ভাস্কর, তোমার কৃপায় আমি যেন আজ নূতন নয়ন লাভ করেছি।"

ভাস্করাচার্য্য ঈষদ্ধাসিয়া কহিলেন, "আমার প্রস্তুত সুধায় যে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাতেই আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম, রঘুজী!"

"বলতো আমায় ঠিক করে, ভাস্করাচার্য্য! আমি আমার অভ্যন্তরে যেরূপ অনুভব

করছি, আমার চেহারাতেও সেইরূপ কোনও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না কি ?"

"অবশ্য, রঘুজী! তবে সে পরিবর্ত্তন কোন ঐন্দ্রজালিক পরিবর্ত্তন নহে। তোমার শুভ্র কেশ শুভ্রই আছে—যৌবনসুলভ ভ্রমরকৃষ্ণ হয় নি। তোমার মুখ পূর্ব্বন্যায় এখনও বার্দ্ধক্য ও চিন্তা রেখাঙ্কিত রয়েছে বটে, কিন্তু তোমার ভিতরে যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে, তোমার মুখে চোখে হাবভাবে, কথায় বার্ত্তায়, এমন কি প্রতি অঙ্গসঞ্চালনেই, সেটা বুঝা যাচ্ছে।"

"এ ভাবটা কি স্থায়ী হবে, না ক্ষণিকের জন্য ?"

"যদি, তুমি আমার উপদেশমত চল, তা হ'লে, আমি পূর্ব্বে যা বলেছি, কোনও আকস্মিক

দুর্ঘটনা ভিন্ন তোমার মরণ অসম্ভব। আমি আর একটী স্ফটিকাধারপূর্ণ এই ঔষধ তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি প্রতিসপ্তাহে দুইবার করিয়া রাত্রিতে শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঁচফোটা এই ঔষধ শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তা হ'লে জরা ও মৃত্যুকে তুমি চিরদিন উপহাস কর্‌তে পার্‌বে।"

"সত্যই তোমার ক্ষমতা অমানুষিক, তোমার বিদ্যাবল অতুলনীয়, ভাস্করাচার্য্য! তোমার উচিত ছিল একটি রাজ্যের রাজা হওয়া।"

"আমার আকাঙ্ক্ষা অত নীচে নহে, রঘুজী। আমার উচিত ছিল একটি পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব লাভ।"

"ঐ তো তোমার দোষ, ভাস্করাচার্য্য!

তোমার আকাঙ্ক্ষা অসম্ভব উচ্চ। তোমার কিছুতেই সন্তোষ বা পরিতৃপ্তি নাই।"

"আত্মার পরিতৃপ্তি কি কখনও সম্ভব, রঘুজী? আত্মার যে আকাঙ্ক্ষা তাহার উচ্চতা নাই, নীচতা নাই, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। যা লোকে পায় আমি তা কেন পাবো না?"

"না পাবার অবশ্য কোন কারণ নাই। কিন্তু সেটা লাভ কর্‌তে যে সময়ের প্রয়োজন, সে সময় যদি তুমি না পাও?"

"কেন পাবো না? আমি মর্‌বো না। আমি অনন্ত—অনন্ত কাল বেঁচে আছি। অনন্ত অনন্ত কাল বেঁচে থাক্‌বো।"

এইরূপ নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে সময় জলের ন্যায় কাটিতে লাগিল। রঘুজী পন্থের আশ্রমে মধ্যাহ্ন

ভোজন সমাপন করিয়া, ভাস্করাচার্য্য অপরাহ্নেই উজ্জয়িনী অভিমুখে "প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধ রঘুজীপন্থ যুবার ন্যায় উৎসাহে আবার বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সেই দিন প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রে ভাস্করাচার্য্য উজ্জয়িনীতে আপন আবাসে গিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার আবাসের সমস্ত কক্ষেই সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিত। প্রবেশদ্বার ভিতর হইতে বদ্ধ থাকিলেও, ভাস্করাচার্য্যের নিজের নিকট সমস্ত দ্বারেরই গাতালার একটি করিয়া চাবি থাকিত। তিনি সেই চাবির সাহায্যে বাড়ীর অন্য কাহাকেও বিরক্ত না করিয়া যখন ইচ্ছা তখন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে অথবা বাহির হইয়া যাইতে পারিতেন। যখন ভাস্করাচার্য্য বাড়ী আসিলেন তখন

বাড়ীর আর সকলেই নিদ্রাগত। কেবল প্রদ্যুম্ন ভাস্করাচার্য্যের কক্ষে বসিয়া পাঠ করিতেছিল। তখনও নিদ্রা যায় নাই। হঠাৎ ভাস্করাচার্য্য আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করায়, সে একটু চমকিয়া উঠিল। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিবামাত্রই যেন কি একটু ভাবান্তরের চিহ্ন দেখিয়া, তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন "প্রদ্যুম্ন !"

প্রদ্যু। আজ্ঞা করুন্, গুরুদেব !

ভাস্করা। তোমার কি হয়েছে, প্রদ্যুম্ন ! তুমি ওকি পাঠ কর্‌ছ ?

প্রদ্যু। কই ! কিছুই হয় নি। আপনি যে পুঁথিখানি ভুলে বাহিরে ফেলে গিয়েছিলেন, আমি কোন কাজ না থাকায় সেই খানি পাঠ কর্‌ছি। যা হ'ক ! রঘুপাগলকে

কেমন দেখে এলেন্। কথায় বলে "রাম মিলায়া জুড়ি।"

ভাস্করাচার্য্য বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে একবার কঠোর দৃষ্টিতে প্রত্যুম্নের চোখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে প্রত্যুম্নের সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মুখের ভাব সেইরূপ শ্লেষ-পূর্ণ ও অবজ্ঞা-সূচক।

ভাস্করা। প্রত্যুম্ন, তুমি কি ব'লছ?

প্রত্যু। যা বল্‌ছি, আপনার কাণ তো আছে, নিশ্চয় শুন্‌তে পাচ্ছেন। আরও স্পষ্ট যদি শুন্‌তে চান্, তবে শুনুন, আমি এই দাসত্ব-পাশ ছিন্ন করতে চাই। আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আর আমি আপনার ভেল্কিতে ভুল্‌ব না। আমি সব জেনেছি। আপনার কোনও রহস্য আর আমার নিকট

গোপন নাই। আমি সব জেনেছি। আমি স্বচক্ষে তাকে দেখেছি।

ভাস্করা। তাকে! কাকে দেখেছ প্রত্যয়।

প্রত্য। ঐ ত্রিতলের কক্ষে, যে অসূর্য্যা-স্পশ্যা সুন্দরীকে আপনি এনে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছেন, তাকে। যে অনাঘ্রাত চম্পক-কলিকার সুগন্ধে, আজ জগৎ মাতোয়ারা হ'ত, তাকে—এ কি নিষ্ঠুরতা নয়?

ভাস্করা। কে তোমাকে সে কক্ষে নিয়ে গেল?

প্রত্য। কৃত্তিকা।

ভাস্করা। কৃত্তিকা! ঠিক! রমণী ভিন্ন এরূপ বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া আর কাহার সম্ভব? তুমি বোধ হয় সেই সুপ্ত রমণীকে স্পর্শ করতে সাহস করনি?

নবম পরিচ্ছেদ

প্রত্যু। কেন সাহস করব না। আমি তাকে স্পর্শ ক'রেছি। তাকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছি। পারি নি। তার ঘুম ভাঙ্গাতে পারি নি। গুরুদেব! নিষ্ঠুর! যদি ভাল চান, এই রমণীকে মুক্তি দিন। আমাকেও মুক্তি দিন। আমি রমণীকে বড় ভালবেসেছি।

ভাস্করা। ভালবেসেছ? কি করেছ হতভাগা! তুমি কাকে ভালবেসেছ? সে যে ভাস্কর-খোদিত প্রস্তর গঠিত প্রতিমূর্ত্তি। তার কি প্রাণ আছে, যে তোমার প্রেমের প্রতিদান পাবে?

প্রত্যু। প্রাণ নেই? কার চোখে ধূলো দিবার চেষ্টা করছেন, গুরুদেব? প্রাণ নেই যদি, তবে কেন আমার স্পর্শ মাত্রেই তার নিদ্রালস নয়নকোণে হাসির রেখা ফুটে উঠলো?

ভাস্করা। হায় ভ্রান্ত যুবক! তুমি যাকে ভালবেসেছ সে অন্যূন ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করেছে। আমি ঔষধের দ্বারা তার ঐহিক দেহটিকে রক্ষা করেছি। আমিই যোগ বলে, অতি ক্ষীণ-সূত্রে তার আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ যুক্ত রেখেছি। শোন, প্রদ্যুম্ন, এই রমণীর সম্বন্ধে, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা আমি তোমাকে বলছি, শোন! ছয় বৎসর পূর্ব্বে বদ্রিনারায়ণের পথে যেতে যেতে লছমনঝোলার নিকট একটি যাত্রী-দলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই দলের মধ্যে একটী প্রৌঢ়া রমণী ও দশ এগার বৎসরের একটি বালিকা হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়। সেই দলের অপরাপর যাত্রীরা তাহাদিগকে রাস্তায় ফেলে রেখে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে। আমি সেই

নবম পরিচ্ছেদ

দুইজন অসহায়াকে পথ হতে তুলে আমাদের আশ্রমে নিয়ে যাই। উপযুক্ত পরিচর্য্যার ফলে ও ঔষধের বলে প্রৌঢ়া আরোগ্য লাভ করে। সেই এই কৃত্তিকা। বালিকা মারা পড়ে। প্রদ্যুম্ন, তুমি বোধ হয় জান যে আমি বহুকাল আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম এবং তদ্বিষয়ে একটু জ্ঞানও আমার ছিল। সেই শাস্ত্র হইতেই আমি জানিয়াছিলাম, যে বিসূচিকা রোগে, অনেক সময়ে, রোগী মারা পড়িলেও, মৃত্যুর অব্যবহিত কিছু কাল পর্য্যন্ত তাহার দেহে জীবনী-শক্তি গুহ্য ভাবে অবস্থিতি করে। সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া আমি এই বালিকার উপর আমার আবিষ্কৃত একটী ঔষধের ফলাফল দেখিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলাম। মৃতার স্কন্ধদেশ সূচী বিদ্ধ

করিয়া সেই রন্ধ্রপথে পিচকারী দিয়া সেই ওষধি তাহার মস্তিষ্কে ও স্নায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করাইয়া দিলাম। পরে তাহাকে উত্তান ভাবে শয্যোপরি শয়ান করিয়া উদ্গ্রীব ভাবে ঔষধের ফলাফল দেখিতে লাগিলাম। প্রায় অৰ্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত এই বালিকার দেহে জীবচ্ছক্তির কোনও লক্ষণই বুঝতে পারলুম না। কিন্তু আমি হতাশ হবার নই। আমি পুনর্ব্বার, এই রমণীর স্কন্ধ দেশের ঠিক মধ্যস্থলে, যেখানে সমস্ত শিরা ও স্নায়ুমণ্ডলী মিলিত হইয়া মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে অস্ত্রোপচার করিয়া, ঔষধ প্রয়োগ করিলাম। এতক্ষণে আমার আশা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। কিছুক্ষণ পরে আমি রমণীর নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলাম অতি

মৃত ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে। অতি সন্তর্পণে বুকে হাত দিয়া দেখিলাম হৃৎপিণ্ডের ও স্পন্দন আরব্ধ হইয়াছে। সেই সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত কেবল মাত্র ঔষধের বলেই এই বালিকাকে জীবিতার ন্যায় রাখিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে মৃতা।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রদ্যুম্ন কহিল, "যদি বাস্তবিক সে মৃতা তবে, বালিকার অঙ্গে কি করিয়া যুবতীর লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে।"

ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, "তাহাও ঔষধেরই বলে। এখন বল, প্রদ্যুম্ন একজন মৃত ব্যক্তির উপরে পরীক্ষা দ্বারা জগদ্ধিতকর কোন সত্য আবিষ্কার করায় প্রয়াস কি নিন্দনীয়?"

"আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

"যাহা বুঝিতে পার না তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে যাওয়া কি মূর্খতা নয়? প্রদ্যুম্ন, আমার কথা শুন! নিষ্ফল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, অজ্ঞানতার প্ররোচনে, আমার জীবনব্যাপী সাধনার মূলে কুঠারাঘাত করিও না। লীলার নাম পর্য্যন্ত তুমি বিস্মৃত হও।"

"তা কখনও পার্‌ব না।"

"নিশ্চয় পার্‌বে।" এই বার ভাস্করাচার্য্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার প্রতিভা-উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় নির্নিমেষে প্রদ্যুম্নের চক্ষুর দিকে লগ্ন করিয়া কহিলেন, "আমার আজ্ঞা— প্রদ্যুম্ন, তুমি লীলার নাম বিস্মৃত হও।"

প্রদ্যুম্ন যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে অতি তীব্র কালকূটের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরেই সেই জ্বালা শীতল হইল বটে কিন্তু প্রদ্যুম্নের পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল।

বহু চেষ্টায় প্রদ্যুম্ন লীলার নাম পর্য্যন্ত মনে করিতে পারিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

"রমণীর বিশ্বাসঘাতকতা, যুবকের অপরিণাম দর্শিতা ও অবিবেকিতার ফলে, বুঝি বা আমার আজন্মসাধনার ফললাভে আমি বঞ্চিত হতে ব'সেছি। একি বিড়ম্বনা? নিয়তি কি আমার বিরুদ্ধাচরণ কর্‌ছে? আমার স্পর্শ ভিন্ন লীলার দেহে জীবনী শক্তির বিকাশ কেমন করে সম্ভবে? তবে, তার মরণ-ছায়াঙ্কিত মুখে হাসিই বা কোথা থেকে এল? আশ্চর্য্য! আমি ভাস্করাচার্য্য, যে যোগবলে মৃতদেহ পর্য্যন্ত জীবন সঞ্চার কর্‌তে পেরেছে, সে আজ সামান্য মানবের

ন্যায়, অতি ক্ষুদ্র কারণে, উদ্বিগ্ন।” প্রদ্যুম্নকে বিদায় করিয়া দিয়া আপনার কক্ষে বসিয়া, ভাস্করাচার্য্য এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন। এমন সময়ে কৃত্তিকা নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে আসিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ভাস্করাচার্য্য একটু বিরক্তভাবে কঠোর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, কিন্তু কৃত্তিকার মুখে ভীতি বা অপ্রস্তুততার ভাব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাস্করাচার্য্য রিপুজয়ী পুরুষ। কিন্তু কৃত্তিকার ভাব দেখিয়া তাঁহারও মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল।

কৃত্তিকা। আচার্য্য বোধ হয় খুব রেগেছেন।

ভাস্করাচার্য্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে কহিলেন, “কৃত্তিকা! তুমি কেন এই বিশ্বাসঘাতকতার

কাজ কর্‌লে? আমার ছয়বৎসরের সাধনার ফল নষ্ট কর্‌লে?"

কৃত্তি। গুরু! আপনারই ভালর জন্য।

ভাস্করা। কি ভাল?

কৃত্তি। শুনুন নরদেবতা! আপনি বিদ্যাবলে আপনাকে দেবতার সমকক্ষ করে তুলেছেন। কিন্তু আসল জিনিস পান নি। সোণা ফেলে আঁচোলে গেরো দিচ্ছেন।

ভাস্করা। হেঁয়ালি ছেড়ে, সরল ভাষায় বল, কৃত্তিকা!

কৃত্তি। বল্‌বো? শুন্‌বেন? তবে শুনুন, আচার্য্য! পৃথিবীতে নরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার দ্রব্য হচ্ছে—রমণীর ভালবাসা। আপনি সেই রত্ন লাভ করে, হেলায় হারাচ্ছেন। কৃত্তিকা কি তা দেখে চুপ ক'রে

থাক্‌তে পারে? না, আপনার অসন্তোষ বা ক্রোধকে সে ভয় করে?

ভাস্করা। আমি তোমার প্রলাপ শুন্‌তে চাই না। এখন বল, লীলা কেমন আছে?

কৃত্তিকা। ঠিক তেমনি। তেমনই জড়। তেমনই অসাড়। প্রদ্যুম্ন কত ডাক্‌লে। কোনও সাড়া পেলে না। সে তোমাকে চায়, তোমাকে চেনে। আর কাহাকেও সে চায় না। আর কাহারও কথায় সে কান দেয় না। হে দাম্ভিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী নরদেবতা! শুন, তুমি সমস্ত বিদ্যার পরপারে গিয়েছ, আমি মানি। কিন্তু, বড়ই দুঃখের কথা, তুমি রমণী-হৃদয় কি উপাদানে গড়া, তা বোঝ নি।

ভাস্করা। ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয় ব্যবচ্ছেদ করে,

তার উপাদান নির্ণয় করা যার কাজ, সামান্য প্রজাপতির হৃদয় নিয়ে তোলাপাড়া কি তার পক্ষে নিতান্ত উপহসনীয় নয়?

কৃত্তিকা। প্রজাপতি কি ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। প্রজাপতির কি হৃদয় নাই? তার হৃদয়ে কি আশা নাই, বাসনা নাই, প্রেম নাই? আচার্য্য আপনি শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও এমন চক্ষুহীন কেন? সর্ব্বজীবে দয়াপরবশ হয়েও এমন নির্দ্দয় কেন? লীলা আপনার। আমি চাই লীলার সহিত আপনার মিলন। আমি কি জন্য আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেছি জানেন? আপনার হৃদয়ে ঈর্ষ্যার বিষ ঢুকিয়ে দেবার জন্য। ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত না হলে ভালবাসার জিনিসকে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা তত উৎকট হয় না। সেই জন্য।

দশম পরিচ্ছেদ

ভাস্করা। যাও কৃত্তিকা! তোমার অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিবার অবসর আমার নাই। এবারের জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম যেন বারান্তরে আর এরূপ না হয়।

কৃত্তিকা শির নোয়াইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ভাস্করাচার্য্য ভাবিতে লাগিলেন, "কি অসার মূর্খ আমি! তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়ার পূর্ব্বেই আমি কেন তার রসনাকে স্তম্ভিত করে দিলাম না। যে ক্ষমতার গর্ব্বে আমি গর্ব্বিত, সেই ক্ষমতা আমার কোথায় ছিল? কেবল ভালবাসা! কেবল প্রেম! স্ত্রীলোকের হৃদয় কি আর কোন উচ্চতর প্রবৃত্তি পোষণ করতে পারে না? রাত দিন সেই এক. কথা, সেই এক চিন্তা। লীলার

প্রেম! মূর্খ রমণী! মন্ত্রশক্তিতে উজ্জীবিত পাষাণ প্রতিমার হৃদয়ে আবার প্রেম কি? লীলার আত্মার কি কোন স্বাধীন সত্তা আছে? না! যাই একবার লীলাকে দেখে আসি। দেখে আসি প্রদ্যুম্ন ও কৃত্তিকা আমার সিদ্ধির পথে কতদূর অনিষ্ট সাধন করেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

লীলার কক্ষ নিস্তব্ধ, রজতের দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। মুক্ত বাতায়ন পথে কুসুম সুরভিত মন্দ মন্দ সমীরণ কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। লীলা শয্যায় সুখসুপ্ত। তাহার মুখ সুন্দর কিন্তু একটু ফ্যাকাসে।

একটী বিচিত্র পতঙ্গ আলোক-মুগ্ধ হইয়া বার বার সেই দিকে যাইতেছে, কিন্তু স্ফটিকময় আলোর আধারে বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, আবার অভ্যন্তরে প্রবেশ-চেষ্টা করিতেছে।

ভাস্করাচার্য্য সেই হতভাগ্য পতঙ্গের

দিকে চাহিয়া মৌনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আলোকের মধ্যে! অগ্নির মধ্যে! পুড়িয়া ছারখার হইবার জন্য। উচ্চ আকাঙ্ক্ষার এই পরিণাম! কেন? কি উদ্দেশ্যে? কে ইহার উত্তর দিবে? এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিবে কে?" ভাস্করাচার্য্য একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলিদ্বারা লীলার মণিবন্ধ স্পৃষ্ট, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় লীলার মুখের দিকে আবদ্ধ। ভাস্করাচার্য্য সহসা লীলার মুখে চেতনার আভাস দেখিতে পাইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন, "লীলা! এসেছ।"

লীলার মুখে অতি কোমল হাসি ফুটিল। সে উত্তর দিল "হাঁ!"

"বল তো লীলা! তুমি কোথায়?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

"এই তো তোমার কাছে। আমার ডান হাত, তোমার ডান হাতের মধ্যে।"

"তা হলে, তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ।"

"কই না! তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তবে তোমার স্পর্শ আমি অনুভব কর্‌ছি।"

"লীলা! তুমি একলা আছ? না তোমার সঙ্গে আর কেহ আছে?"

"আমি একলা। আমি চিরদিনই একলা।"

"বল লীলা! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"তুমি যে আমাকে নরকের সন্ধান কর্‌তে পাঠিয়েছিলে। আমি তারই অন্বেষণে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলাম। নরক কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না। তুমি যা

বল্‌ছ, ঈশ্বরের রাজ্যে কোথাও তা নাই। দুঃখ জরা মৃত্যু—কিছুই নাই। যেখানে যাই, কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল আলো, কেবল প্রেম।"

লীলার কথা শুনিয়া ভাস্করাচার্য্যের মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া আসিল।

লীলা আবার বলিতে আরম্ভ করিল। "ঈশ্বর আনন্দময়, তিনি আলোকময়, প্রেমময়। তাঁর সৃষ্টিতে নিরানন্দ কিংবা অন্ধকার কি কখনও থাকিতে পারে? যদি তাহা থাকে তবে তাহা তোমাদের পৃথিবীতে। ঈশ্বরের রাজ্যে শোক নাই, তাপ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। স্থির জানিও।"

"শোক দুঃখ জরা মৃত্যু নিশ্চয় আছে লীলা! কিন্তু তুমি তা বুঝ্‌তে পার না।

তুমি নিজে সুন্দর, তাই তোমার কাছে সবই সৌন্দর্য্যময় মনে হয়।"

ভাস্করাচার্য্যের কথায় লীলা যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "এত অবিশ্বাস, তবে তোমার হৃদয়ে প্রেম কেমন করে স্থান পাবে বল? প্রেম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্দেহ নরক। সন্দেহে ঈশ্বরকে মিলে না।"

"লীলা! তুমি আমায় আলোকে নিয়ে যাও। তুমি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করে দাও। আমাকে বিশ্বাসের পথ দেখিয়ে দাও। আমায় বল, যদি দুঃখ, জরা, মৃত্যু না থাকে তবে পাপের কি কোন দণ্ড নাই।"

"পাপ নিজে নিজেকে দণ্ড দেয়—ইহাই ঈশ্বরের বিধান।"

"তুমি তা হলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর!"

"নিশ্চয়।"

"স্বর্গে ?"

"একটি নহে, কোটি কোটি, অনন্ত। তার সংখ্যা করা যায় না। ভাল কথা! কাল রাত্রে কি তুমি আমাকে ডেকেছিলে ?"

ভাস্করাচার্য্যের হৃদয় গুর্‌গুর্‌ করিয়া উঠিল। হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "কেন, বল তো লীলা ?"

"কে আমায় কাল নাম ধরে ডাক্‌ছিল। সে কিন্তু তোমার গলা নয়। তার গলা বড় মিষ্ট, বড় নরম। যেন প্রেমে পূর্ণ। সে আমায় ভালবাসে। ভালবাসা বড় মধুর। তোমাদের পৃথিবীতে ভালবাসাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী।"

লীলা তো তাহা হইলে প্রদ্যুম্নের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, তাহা হইলে প্রেম কি

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাস্তবিক • যোগবলের সহিত তুল্যমূল্য।
ভাস্করাচার্য্যের মনে বিষম সন্দেহ জাগিয়া
উঠিল।

লীলাকে পুনরায় যোগনিদ্রায় অভিভূত
করাইয়া, ভাস্করাচার্য্য চিন্তাকুলিত হৃদয়ে গিয়া
নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সেই দিন শেষ রাত্রিতে ভয়ানক বৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হইল। তাহার পর দিনও ঝড় জল থামিল না। ভাস্করাচার্য্য সেদিন আর কোথাও বাহির হইলেন না। ঘরে বসিয়া নানা প্রকারের চিঠি পত্রাদির উত্তর দিলেন ও পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বাতায়নে বসিয়া প্রকৃতির এই ক্ষিপ্ত লীলা দেখিতেছেন, আর মনে মনে হাসিতেছেন এমন সময়ে, প্রদ্যুম্ন একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ভাস্করাচার্য্যের কক্ষে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আগন্তুককে দেখিয়াই ভাস্করাচার্য্য আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "প্রভো! অসময়ে কি প্রয়োজনে আগমন! আপনার পবিত্র পদরজ-স্পর্শে, আমার আশ্রম পবিত্র হ'ল। প্রদ্যুম্ন! প্রণত হও, ইনি মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য। ইঁহার নাম ত্রোটকাচার্য্য।"

প্রদ্যুম্ন প্রণত হইল। ত্রোটকাচার্য্য আসন গ্রহণ করিয়া প্রথমে ভাস্করাচার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ভাস্করাচার্য্য! তোমার আপ্যায়নে আমি পরম সন্তুষ্টি লাভ কর্‌লাম।" পরে, প্রদ্যুম্নের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বালক প্রদ্যুম্ন দেখিতেছি বেশ বড়সড় হইয়া উঠিয়াছে। সে কি এখনও তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির ক্রীতদাসই আছে?"

"প্রভো! আপনার কথার অর্থ আমি সম্যক্ উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লাম না। গুরুর প্রতি শিষ্যের ঐকান্তিকী আজ্ঞানুবর্ত্তিতা কি দোষের?"

ত্রোটকাচার্য্য ঈষৎ হাসিলেন। ভাস্করাচার্য্য তর্কে পরাস্ত হইবার নহেন। কিন্তু প্রদ্যুম্নের কানে, ত্রোটকাচার্য্যের কথাগুলি যেন একটি অর্থপূর্ণ ঝঙ্কার দিল। সে বিনীতভাবে কহিল, "ভগবন্! আমার হৃদয়ে বিষম ঝটিকা। আমার কি হইবে?"

ত্রোটকা। বৎস! দেখিতেছ না? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ঝটিকা! ভয় পাইয়ো না! শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে শান্তি পাবে।

প্রদ্যুম্ন ত্রোটকাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রোটকাচার্য্য ভাস্করাচার্য্যকে কহিলেন, "ভাস্করাচার্য্য তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এই যন্ত্রণাময় সংসার হ'তে চিরতরে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন জ্ঞানে, এখানে এলাম।

ভাস্করা। সে কি? আপনি কি মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন? আপনি কি মর্‌বেন?

ত্রোটকা। না!—বাঁচ্‌বো। সাধারণে যাকে মৃত্যু বলে, আমরা সেটাকে নবীন জীবন বলি। ভাস্করাচার্য্য বিদ্যাবুদ্ধি কার্য্যকারিতা শক্তিতে তুমি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গৌরব। কিন্তু বিষম ভ্রমান্ধ। তুমি নিতান্ত দাম্ভিক। তুমি ভগবৎ-শক্তিকে তুচ্ছ কর। তোমার পতন অবশ্য-ম্ভাবী। এখনও তোমার গতি পরিবর্ত্তিত কর।

ভাস্করা। ত্রোটকাচার্য্য! আমি বালক নহি, যে অস্তিত্বহীন জুজুর ভয় দেখিয়ে আমাকে আমার সংকল্প হ'তে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌বে। সত্য কথা বল্‌তে কি, প্রভো! আপনার বক্তব্য কি, তা এখনও আমি ঠিক ধারণা কর্‌তে পার্‌ছি নি।

ত্রোটকা। দম্ভী ভাস্করাচার্য্য! অসামান্য মস্তিষ্কসম্পদে তুমি সম্পন্ন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না যে অনন্তের মুখ থেকে রহস্যের অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তোমার নিজের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত কর্‌ছো। ভাস্করাচার্য্য তোমার সম্মুখে ভয়ানক বিপদ। এখনও সাবধান হও। অনর্থক মিথ্যার পশ্চাতে ঘুরিও না। সত্যকে আপনার বলিয়া গ্রহণ কর।

ভাস্করা। প্রকৃতিই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তার মূল।

প্রকৃতিই সত্য। প্রকৃতিই আমার উপাস্যা দেবী। ব্রহ্ম প্রপঞ্চ মাত্র।

ত্রোটকা। রজ্জুতে সর্পভ্রমের কারণ যেমন ইন্দ্রিয়ের দোষ, সেইরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ-প্রতীতির কারণ অনাদি অবিদ্যারূপ দোষ। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্তমাত্র, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত-মাত্র।

ভাস্করা। আমার বিবেচনায়, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহার অসাধারণ বৃত্তি অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। অধ্যবসায় ভিন্ন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রশস্ততর পন্থা আর নাই।

ত্রোটকা। বুদ্ধির ধর্ম্ম আটটি—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। ইহাদের প্রথম চারিটি সাত্ত্বিক,

শেষোক্ত চারিটি তামসিক। সাত্ত্বিক পন্থাই প্রশস্ত পন্থা। তামসিক পন্থা প্রকৃত বিবেক লাভের অন্তরায়। আরও শুন, যতদিন না পুরুষের বিবেক-খ্যাতি হইবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ করিবে না। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক খ্যাতি জন্মাইয়া আপনিই অপসৃত হইবে। ভাস্করাচার্য্য! লীলারও অপসৃতির সময় আসিতেছে।

ভাস্করা। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, লীলার পিঞ্জরাবদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করা, ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁরও সাধ্যায়ত্ত নহে। লীলা আমার।

ত্রোটকা। বিশ্বাসবিহীন বিপথগত ক্ষুদ্র মানব। ঈশ্বরের সহিত প্রতিযোগিতা। মূর্খতা ও অজ্ঞতাপূর্ণ সংসারের লোককে দুটো ইন্দ্রজাল দেখিয়ে ভোলাতে পার। কিন্তু

সে কুহকের অর্থ কি তাহা অন্যে না বুঝ্‌তে পারুক্‌, তুমি তো নিশ্চয় জান। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌ছি লীলা তোমার নয়। লীলা ঈশ্বরের। তোমার বিশ্বাস না হয় চল, তোমারই করতলগত আত্মার নিজের সাক্ষ্য গ্রহণ কর্‌বে, চল!

এই বলিয়া ভাস্করাচার্য্য উঠিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন। ত্রোটকাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে ত্রিতলে লীলার শয়ন কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিল্পী যেমন আপনার রচিত শিল্প অপরকে দেখাইয়া ও তাহাদের প্রশংসা লাভ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করে,—পর্য্যঙ্কোপরি কুহকনিদ্রাঘোরাচ্ছন্না ফুল্লারবিন্দবদনা লীলাকে দেখাইয়া ভাস্করাচার্য্যও সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ত্রোটকাচার্য্যের মুখে কিন্তু কৌতূহলের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। তবে কি ত্রোটকাচার্য্য ভাস্করাচার্য্যের অমানুষিক জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঈর্ষ্যান্বিত। কেন? ত্রোটকাচার্য্যেরও তো জ্ঞান ভাস্করা-

চার্য্য অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। আর প্রতিষ্ঠা। শঙ্করের অবতার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য। তাঁহার আবার প্রতিষ্ঠার অভাব কি ?

তর্জ্জনী-সঙ্কেতে লীলাকে দেখাইয়া গর্ব্বিত ভাবে ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, "ত্রোটকাচার্য্য! ওই দেখুন, ওই অপূর্ব্ব রমণী কুসুম-কলিকাটি, আমি ছয় বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুর করাল হস্ত হ'তে ছিনিয়ে এনে, আমার জ্ঞানোদ্যানে রোপিত করেছিলাম। আজ সেই লতিকাটি যৌবনের লাবণ্যভারে নুয়ে পড়্‌ছে।"

ত্রোটকাচার্য্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ভাস্করাচার্য্য তুমি যাকে দেখে এত গর্ব্বিত, তার আসল মূর্ত্তি ত' তুমি দেখ নাই। আমি তাকে তার আসল মূর্ত্তিতে দেখেছি।"

"কার আসল মূর্ত্তি ?"

"লীলার।"

"আমার লীলার ?"

"লীলা তোমার কখনই নয় ? লীলা ঈশ্বরের।"

"ওই দেখ ত্রোটকাচার্য্য ! লীলা তোমার কথা শুনে মৃদু হাস্য ক'র্ছে।"

"আমার কথা শুনে নয়। তোমার কথা শুনে। এ সম্বন্ধে লীলার নিজের সাক্ষ্য তো তুমি বিশ্বাস ক'র্বে ?"

"অবশ্য !"

"তবে লীলাকেই জিজ্ঞাসা কর।"

ভাস্করাচার্য্য গিয়া লীলার পর্য্যঙ্কপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ত্রোটকাচার্য্য অদূরে একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন।

লীলার দক্ষিণ হস্তখানি নিজের দক্ষিণ

হস্তের মধ্যে লইয়া ভাস্করাচার্য্য লীলার শরীরে তাঁহার প্রবল তড়িচ্ছক্তি সংক্রামিত করিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ যেন লীলার মুখে তিনি কোন পরিবর্ত্তনই দেখিতে পাইলেন না।

সোৎসুক কণ্ঠে ভাস্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলা! তুমি কোথায়?"

লীলা ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"এই যে, আমি এখানেই আছি।"

ভাস্করা। তুমি কতক্ষণ হ'ল এখানে এসেছ?

লীলা। যখন গুরুদেব এখানে এসেছেন, আমি ঠিক তখনই এখানে এসেছি।

"কে গুরুদেব?"

"এই যে যিনি ওখানে আমাদের কাছে বসে আছেন।"

"উঁহাকে কি তুমি চেন লীলা ?"

"কেন চিন্‌বো না। ওঁরই কাছে তো আমি রাতদিন থাকি। ওঁরি কাছে থাক্‌তেই তো আমি ভালবাসি।"

"তা হলে, আমার কাছে আস্‌তে তুমি ভালবাস না।"

"না! কেন ভালবাস্‌বো! তোমার যে প্রাণ নাই। তুমি যে আমার কথায় বিশ্বাস কর না। তুমি যে আমাকে বড় ঘোরাও। আমার কষ্ট হয় না ?"

"তবে তুমি কা'কে ভালবাস ?"

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং
ন তস্ত কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমি সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসি।

"অব্যক্ত, অচিন্ত্য অনন্ত পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ কবির কল্পনা মাত্র।

ত্রোটকাচার্য্য ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীরভাবে ভাস্করাচার্য্যকে বলিলেন, "চক্ষু থাকিতেও যে অন্ধ, নাসিকা থাকিতেও যে গন্ধ পায় না, কর্ণ থাকিতেও যে শুনিতে অক্ষম, তাহার নিকট অবশ্য সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ কবির কল্পনা মাত্র। ভাস্করাচার্য্য বল দেখি এই গৃহে তোমার ও আমার ব্যবধান মধ্যে তুমি কিছু দেখিতে পাইতেছ কি না?

ভাস্করাচার্য্য হাসিয়া উত্তর দিলেন, "শূন্য।"

ত্রোটকাচার্য্য উত্তর দিলেন, "ভাস্করাচার্য্য!

নয়ন উন্মীলন কর। দেখ, তুমি যে স্থানকে শূন্য বল্‌ছিলে, সেই স্থানে কি বিরাট পুরুষ-মূর্ত্তি।

'একোবশী সর্ব্বভূতান্তবাত্মা একং রূপং
বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যোঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং'।"

ত্রোটকাচার্য্য উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত যুক্ত করে ধ্যানস্থ। তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী ভগবান্। চির-আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ দেখিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে ত্রোটকাচার্য্য গাহিতে লাগিলেন,

"উদ্যৎ কোটি দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং
গদাং পঙ্কজং
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোভি-
পার্শ্বদ্বয়ম্।

কোটিরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং
কৌস্তুভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসিলসচ্ছ্রীবৎসচিহ্নং
ভজে।"

সহসা এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় একটি অত্যুৎকট জ্বালা সেই কক্ষটিকে উজলিত করিয়া তুলিল। সে জ্বালা এত তীব্র যে ভাস্করাচার্য্য একটি ভীষণ চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ত্রোটকাচার্য্য যে কখন সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রির মধ্যে ভাস্করাচার্য্যের জ্ঞান হইল না। পরদিন প্রভাতে যখন তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল তখন রাত্রের ঘটনা তাঁহার নিকট স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় যে এত দুর্ব্বল তাহা ভাস্করাচার্য্য এই প্রথম বুঝিতে পারিয়া আপনা আপনিই বড় লজ্জিত হইলেন। তিনি সংসারের লোককে বিভীষিকা দেখাইয়া স্তম্ভিত করেন। আর তিনি নিজেই আজ একটি অমূলক ছায়ামাত্র দর্শনে বালকের ন্যায় ভীত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি চক্ষু

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মুছিয়া একবার কক্ষের চারিধারে দেখিয়া লইলেন। তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে তখনও তাঁহার ঘুমের ঘোর কাটিয়াছে কি না? সহসা ত্রোটকাচার্য্য-লিখিত পত্রখানির উপর তাঁহার নজর পড়িল। তিনি ব্যগ্রভাবে সেখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে কেবল-মাত্র দুইটি ছত্র লিখিত ছিল। তাহা এই—

"শেষ দিন আসিতেছে। প্রেমের সহিত লীলার অবসান, জানিবে।"

কি এক অজানিত বিপৎপাতের আশঙ্কায় ভাস্করাচার্য্যের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

তিনি একবার লীলার মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন তাহার প্রশান্ত সুপ্তমুখে মৃদু হাসির কোমল উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত।

ভাস্করাচার্য্য ছুটিয়া কক্ষের বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "প্রদ্যুম্ন।"

মুহূর্ত্তমধ্যে উত্তর আসিল, "যাই গুরু-দেব!" পরক্ষণেই প্রদ্যুম্ন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে প্রদ্যুম্ন যে কোন কথা অবগত আছে, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝা গেল না। বাস্তবিক সে কিছুই জানিতও না।

ভাস্করাচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "ত্রোটকাচার্য্য কি চলিয়া গিয়াছেন?"

প্রদ্যুম্ন। বোধ হয়! সকালে উঠিয়া আমি তাঁহাকে দেখি নাই। কেন? তিনি যাইবার সময় আপনাকে কি কিছু বলিয়া যান নাই?

ভাস্করা। বোধ হয় আমাকে নিদ্রোত্থিত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কোন বিশেষ

প্রয়োজনে রাত্রেই এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্যের মুখের ভাবে দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! আজ আপনার মুখ একটু বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? কোন উদ্বেগের কারণ হইয়াছে কি?"

ভাস্করা। না প্রদ্যুম্ন! এমন কোন বিশেষ কারণ নাই। তবে কাল রাত্রি হইতে আমার শরীরটা তত ভাল নাই।

প্রদ্যুম্ন ভাস্করাচার্য্যের সঙ্গে যত দিন আছে তাহার মধ্যে কোন দিনও সে ভাস্করাচার্য্যকে তাহার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলিতে শুনে নাই। এই আজ এ কথা প্রথমে তাঁহার মুখে শুনিল।

প্রদ্যুম্ন কহিল, "গুরুদেব কা'ল গভীর রাত্রে, হঠাৎ আমার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। আমার কখনও এমন হয় না। আমি যেন আপনার সকরুণ আওয়াজে, প্রদ্যুম্ন —প্রদ্যুম্ন বলে আপনার ডাক শুন্‌তে পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে আপনার ঘরের নিকট গিয়ে দেখ্‌লাম দ্বার অর্গলাবদ্ধ। আমি আমার ভ্রম হয়েছে মনে করে আবার গিয়ে শয়ন কর্‌লাম।"

ভাস্করা। কি! আমার শয়নগৃহের দ্বার ভিতর হ'তে রুদ্ধ দেখ্‌লে?

প্রদ্যুম্ন। হাঁ গুরুদেব!

ভাস্করাচার্য্য ব্যাপার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি তো সমস্ত রাত্রি মূর্চ্ছিত অবস্থায় লীলার কক্ষেই পড়িয়া-ছিলেন। তাহা হইলে, প্রদ্যুম্নকেই বা

ডাকিল কে?' আর তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারই বা ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ কে করিল? এ কি রহস্য?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যে রজনীতে উজ্জয়িনী নগরে ভাস্করাচার্য্যের আবাসে এই রহস্যময় ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল, সে রাত্রে রঘুজীপন্থের আশ্রমেও ভয়ানক একটি দুর্ঘটনা ঘটে।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়াই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। প্রবল বেগে ঝটিকা বহিতেছিল। রঘুজী তাঁহার টিলের ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহার শিলাযন্ত্রের পানে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মঙ্গল গ্রহ হইতে প্রেরিত আলোক-বার্ত্তার অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রজনী দ্বিপ্রহরের কিছু পরেই সহসা আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। মেঘমুক্ত নীলাকাশে উজ্জ্বল বিভায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিকাশ হইল। রঘুজী অতিমাত্র আশান্বিত হইয়া কক্ষের একটী গবাক্ষ উন্মোচিত করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন তাহার স্ফটিকময় ঘূর্ণ্যমান শিলাযন্ত্রের উপরে যেন এক বিন্দু শোণিতপাত হইয়াছে। ক্রমে সেই বিন্দুটি আয়তনে বর্দ্ধিত হইতে হইতে সমস্ত শিলাখণ্ডটিকে যেন ছাইয়া ফেলিয়া দিল।

উল্লাসে রঘুজীর হৃদয় ভরিয়া গেল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি শিলাযন্ত্রটির একেবারে নীচে গিয়া মুগ্ধ নেত্রে সেই অদ্ভুত আলোকবিন্দুর ক্রিয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রঘুজী

কহিলেন, "ধৈর্য্য! ধৈর্য্য! আর একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণদেবতার সন্ধান পাইব। আর এক মুহূর্ত্ত! আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর সুন্দরি! আমি প্রাণভরে তোমার সৌন্দর্য্য-ভরা মুখখানি দেখিয়া লই।"

রঘুজীর বার্দ্ধক্যশীর্ণ ওষ্ঠে তখনও তাহার শেষ কথা কয়টি কম্পিত হইতেছিল। সহসা বাহিরের তীব্র তেজে ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়া বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। তাহার লেলিহান রসনা মুক্ত গবাক্ষপথে আসিয়া ঘূর্ণ্যমান শিলাযন্ত্রের উপর পতিত হইল। সেই ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে যন্ত্রের গতি রুদ্ধ হইল। একটি বজ্রনিনাদ। পরমুহূর্ত্তেই ভীষণ শব্দে গুরুভার শিলাযন্ত্রখানি পতিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আরে রঘুজী! রঘুজী সেই শিলাখণ্ডের নীচে পড়িয়া একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যের ঔষধের বলে নবীভূত রঘুজীর হৃদয়ের শোণিতে সেই উজ্জ্বল শিলাখণ্ডখানি অনুলিপ্ত। রঘুজীর সারাজীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও জ্ঞানচর্চ্চার ফল এক মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইয়া গেল। ভগবানের কোন্ ইচ্ছা তাহাতে পূর্ণ হইল, তাহা কে বলিবে?

রঘুজীর মরণে শোক করিবার লোক সংসারে ছিল কেবল তাহার ভৃত্য বৃদ্ধ মহাদেও। সে এই আকস্মিক বিপৎপাতে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া ভাস্করাচার্য্যকে এই সংবাদ দিবার জন্য পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই উজ্জয়িনী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেই দিন মধ্যাহ্নেই ভাস্করাচার্য্য লীলার কক্ষে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রঘুজীর এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "মানুষের জ্ঞানার্জ্জন পিপাসা কি তাহা হইলে প্রকৃতির অভিপ্রেত বা অনুমোদিত নহে? রঘুজীর সারাজীবনব্যাপী অধ্যয়নের ফল যদি প্রকৃতির একটি কটাক্ষমাত্রে ধূলিসাৎ হইতে পারে, তাহা হইলে, আমার সম্বন্ধেও তাহা হওয়া তো কিছুমাত্র অসম্ভব নয়! না! না! তাহা সম্ভব নয়। রঘুজীর সাধনার

মধ্যে হয় ত, কোন দোষ ছিল। কিন্তু আমার সাধনার মধ্যে কোনও দোষ নাই, কোনও ত্রুটী নাই।"

'এই কথা বলিতে বলিতে ভাস্করাচার্য্য কক্ষ মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন, আর এক একবার লীলার মুখের দিকে সলালস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কি জানি কি এক অজানিত সংশয়ে, এক অননুভূতপূর্ব্ব ভয়ে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। ত্রোটকাচার্য্য-লিখিত পত্র-খানি যেন শোণিতের অক্ষরে ছাপা হইয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। লীলাকে জাগাইয়া তুলিতে আজ যেন ভাস্করাচার্য্যের কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া তিনি লীলার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিয়া, তাহার কোমল

ডান হাতখানি নিজের হস্তে লইলেন। সহসা লীলার গণ্ডযুগে যেন বিকশিত গোলাপের আভা ফুটিয়া উঠিল। নবোদিত সৌরকর স্পর্শে সরোজ-কলিকা যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, লীলার অধরোষ্ঠও সেইরূপ ধীরে ধীরে মুকুলিত হইল। ভাস্করাচার্য্য তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে সে কহিল, "হৃদয়-সখা! আমি এসেছি।"

"এ কি নূতন সম্বোধন! এ কি পরিবর্ত্তন!" ভাস্করাচার্য্য লীলার কথা শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সংযত করিয়া কহিলেন, "আমি তো তোমাকে আহ্বান করি নাই, লীলা!"

"না! আমি আপনিই এসেছি।"

"কেন?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"আজ যে তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই জন্য, না ডাক্‌তেই তোমার কাছে এসেছি। সখা! প্রেমের আহ্বান যে বড় মধুর। তা শুনে কি আমি আর স্থির থাক্‌তে পারি?"

ভাস্করাচার্য্যের শরীরের শিরা-উপশিরার মধ্যে কে যেন তরল অনল ঢালিয়া দিল। ত্রোটকাচার্য্যের ভবিষ্যৎ বাণী তাঁহার মানস-পটে বারবার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, তাঁহাকে নিতান্ত চিন্তা-কুলিত করিয়া তুলিল। "লীলার প্রেমের সহিত তাহার অবসান!"

ভাস্করাচার্য্য সে কথা মনে করিতেও যেন কষ্ট বোধ করিতেছিলেন।

"না! না! কখনও সম্ভব নয়!"

ভাস্করাচার্য্য আপন মনে বলিতে

লাগিলেন, "লীলা আমার! তার আত্মার উপরে আমারই অধিকার! আমি তাঁকে মৃত্যুর কবল হতে ছিনিয়ে এনেছি। আমি ঔষধি বলে তাহার দেহটিকে পঞ্চভূতে বিলীন হতে দিই নি। আমিই যোগবলে তার দেহের সহিত আত্মার মিলন সংঘটন করে তাহার দৈহিক ও মানসিক উন্নতির উপায় বিধান করেছি। লীলা আমার নহে, ত, আর কাহার? লীলা! লীলা!"

"কেন প্রিয়তম?"

"তুমি কি আমায় ভালবাস?"

"বাসি বলেই ত', না ডাক্‌তেই এসেছি। আমি তোমাকে ভালবাসি বটে, কিন্তু কই তুমি আমার ছায়াটিকে ভালবাসছো—কায়াটিকে ভালবাসছো না, এইটি আমার বড় কষ্ট!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"তোমার কায়া আমায় দেখাও লীলা! দেখ আমি তোমাকে ভালবাসি কি না।"

"দেখাবো। আজ নয়। তিন দিন পরে।"

"কেন লীলা! আজ নয় কেন? আমি যে ধৈর্য্য ধরতে পারছি না।"

"তা কেমন করে সম্ভবে? তোমার হৃদয় যে এখনও সংশয়ের অন্ধকারে পূর্ণ। অন্ধকার যেখানে সেখানে কি আমার জ্যোতির্ম্ময়ের বিকাশ হয়? কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলয়ে হরি, তর্কে বহুদূর'!"

"তোমার হরির অস্তিত্ব আগে প্রমাণ কর লীলা! আমি তখন তোমার কথা শুনবো।"

লীলা কক্ষের ভিত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ঐ দেখ সখা!

আমার শ্যামরায় আমার ক্রন্দন শুন্‌তে পেয়েছেন। তিনি নিজেই এসে ভুবন-মোহন বেশে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। যেয়ো না, যেয়ো না সখা! দাসীকে একলা ফেলে যেও না।”

ভাস্করাচার্য্য চারি দিকে চাহিলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, ভাবিলেন, লীলা প্রলাপ বকিতেছে। ভাস্করাচার্য্য কি জানি কি এক অজানিতপূর্ব্ব আবেগে, জ্ঞান হারাইয়া, ধৈর্য্য হারাইয়া লীলাকে তাঁহার বুকের উপর উঠাইয়া লইলেন, তাহার বুকে, মুখে, ললাটে অজস্র চুম্বন করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই লীলার মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে যে লীলার বুকে, মুখে, গায়ে পূর্ণ বিকশিত নলিনীর সুষমা

ক্ষরিত হইতেছিল, এখন তাহা ভ্রষ্টশ্রী, মৃত্যুর করাল কালিমারেখাঙ্কিত। সে দৃশ্য দেখিয়া ভাস্করাচার্য্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি পাগলের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া লীলার পর্য্যঙ্কের পাদদেশে স্থিত একটি স্ফটিকের বিচিত্র আলমারী খুলিয়া একটি সুবৃহৎ স্ফটিকাধার বাহির করিয়া আনিলেন। সেই স্ফটিকাধারের সুবর্ণময় ছিপিটি দাঁতে করিয়া খুলিয়া, অধীর ভাবে ভাস্করাচার্য্য, সেই আধার মধ্যস্থ তরল পদার্থ, লীলার মুখে ঢালিয়া দিলেন। লীলা তাহার এক-বিন্দুও গলাধঃকরণ করিতে পারিল না। সমস্তই তাহার দুই কষ বহিয়া পড়িয়া উপাধানটিকে সিক্ত ও রঞ্জিত করিল।

কেমন করিয়া এই ষোড়শী পূর্ণাবয়বা যুবতী এক মুহূর্ত্তে কৃশাঙ্গী অনুদ্ভিন্নযৌবনা

দশমবর্ষীয়া বালিকার আকার লাভ করিল ইহাই ভাস্করাচার্য্যের বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হইল। ছয় বৎসর পূর্ব্বে বদ্রিনারায়ণের পথে যে বালিকার বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হয় এ যেন সেই বালিকা। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সাধনার ধন লীলার সহিত এই মৃত দেহের কোন সৌসাদৃশ্যই আর দেখিতে পাইতেছিলেন না। ঔষধের বলে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করার কল্পনাটাও যেন তাঁহার নিকট এক্ষণে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

তবু তিনি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একটি তীক্ষ্ণধার সূচ্যগ্র ছুরিকা লইয়া তিনি লীলার হস্তের শিরার উপর অস্ত্রোপচার করিলেন। কিন্তু সেই রন্ধ্রপথে এক

বিন্দুও রক্ত পড়িল না দেখিয়া আতঙ্কে ভাস্করাচার্য্যের মুখ শুকাইয়া গেল। একটি পিচকারীর ন্যায় যন্ত্রপূর্ণ ঔষধ লইয়া ভাস্করাচার্য্য সেই ঔষধটি লীলার অঙ্গে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন।

কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। তীব্র দ্রাবক যেমন কিছুতে পতিত হইলে সেই জিনিসটিকে ধীরে ধীরে দগ্ধ বা তরলীভূত করিয়া ফেলে, লীলার শরীরের উপরও ভাস্করাচার্য্য প্রযুক্ত ঔষধি ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিল। লীলার শরীর, সেই শয্যার উপরেই ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

নিরাশায় অতিমাত্র পীড়িত ও যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, "সব ব্যর্থ! সব নিষ্ফল! এত

জ্ঞান, এত চেষ্টা! তাহার পরিণাম —পরাজয়, অপমান, নৈরাশ্য। কার হাতে? যে অদৃশ্য শক্তিতে জন্মেও কখন বিশ্বাস করি নি, তারই হাতে। আমি কখনও ইহা কল্পনাও করতে পারি নি। হে অদৃষ্ট অজানিত শক্তি! আমাকে দেখা দাও। লুকিয়ে থেকো না। মানুষের মস্তিষ্কবলের সঙ্গে, আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমার সত্তা ও প্রাধান্য সপ্রমাণিত কর। তা না হলে হে চোর! হে কপট! হে প্রবঞ্চক! আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবো। আমার লীলার আত্মাকে তুমি যেখানেই লুকিয়ে রাখো আমি সেই খান থেকেই তাকে টেনে বার করবো। লীলা! লীলা! দাঁড়াও, আমায় কেবল-মাত্র পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আমি

তস্কর মৃত্যুর হাত হতে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আস্‌ব।”

ভাস্করাচার্য্য তাঁহার আলমারি খুলিয়া একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিলেন। তাহার উপর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া ঝলমল করিতে লাগিল।

ভাস্করাচার্য্য সেই শাণিত অস্ত্রের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “শুন আকাশ, বাতাস, দুঃখপূর্ণ দারিদ্র্যপূর্ণ হিংসা দ্বেষ কলহপূর্ণ বসুন্ধরা তুমিও শুন, আমার বহুশতবর্ষব্যাপী জ্ঞানার্জ্জনের ফলে আমি যে সত্যে উপনীত, তা আমি আজ এই মরণের প্রাক্কালে তোমাদের নিকট উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ কর্‌ছি। সে সত্যটি এই। ঈশ্বর আছেন। কিন্তু লোকে তাঁকে ভুল ক'রে দয়াময় বলে। তিনি বড়

নির্দ্দয়! বড় যথেচ্ছাচারী! বড় শক্তিমান্! ভগবান্! আমি শিখেছি। আমি তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছি! আমি তোমায় চিন্‌তে পেরেছি। আমি জান্‌তে পেরেছি যে তোমায় আমায় কোনও পার্থক্য নাই। আমার মধ্যে তুমি আছ। ঐ ক্ষুদ্র পিপীলিকাটির মধ্যেও তুমি আছ। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি আমাকে পরিবর্ত্তিত কর্‌তে পার বটে, কিন্তু বিনষ্ট কর্‌তে পার না। তোমার যতদূর সাধ্য তুমি আমাকে নির্য্যাতিত করেছ। আমার আজন্ম সাধনার ধনকে তুমি হরণ করেছ। হে প্রাণ দেবতা! আমার প্রাণের মধ্যে, তোমার যে সত্তা নিগূঢ় ভাবে নিহিত রয়েছে, তারই বিরুদ্ধে তুমি আজন্মব্যাপী তুমুল সংগ্রাম করেছ। এখন আমি পরাজিত

এখন আমি বিধ্বস্ত। পরাজিত শত্রুর প্রতি করুণা দেখাও, দয়াময়! যেখানে আমার লীলাকে নিয়ে গিয়েছ, আমাকেও সেই রাস্তা দেখিয়ে দাও। আমি অনন্ত অনন্তকাল নত জানুতে তোমার পূজা করবো।” এই কথা বলিয়া ভাস্করাচার্য্য তাঁহার হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকায় তাঁহার নিজের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় কে আসিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল।

ভাস্করাচার্য্য মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—ত্রোটকাচার্য্য!

ত্রোটকাচার্য্যের মুখ গম্ভীর, প্রশান্ত ও করুণায় মাখান।

ত্রোটকাচার্য্য ধীর গম্ভীর ভাবে স্নেহার্দ্রভাবায় ভাস্করাচার্য্যকে কহিলেন,

"ভাস্করাচার্য্য! তুমি পরমজ্ঞানী হ'য়ে কি কার্য্য করতে যাচ্ছিলে। অনিত্যের জন্য নিত্যধনকে ভুলে যাচ্ছিলে। লীলা কে? লীলা তো মায়ার অপর নাম মাত্র। এই জগৎ লীলায় চালিত, সুতরাং তাত্ত্বিকসত্তাশূন্য ও মিথ্যা। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদিপ্রয়োগ-ক্ষুভ্যমান মায়া-দ্বারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, সেইরূপ মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তুমি জ্ঞানী। তোমাকে একথা বুঝান অনাবশ্যক। লীলা ঈশ্বরের। সে ঈশ্বরেই লীন হয়েছে। সে তোমাকে ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা দেখিয়ে দিয়ে মহাপ্রস্থান করেছে। সেই পন্থা অবলম্বনে তুমিও পরমব্রহ্মলাভ করবে। এস বৎস! পুণ্য-

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ভূমি বদরিকাশ্রমে তোমার জন্য একটি সুন্দর আশ্রম রচনা করা হয়েছে। চল আমরা তথায় যাই।

ত্রোটকাচার্য্য অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন। তাহার পশ্চাতে ভাস্করাচার্য্য। ভাস্করাচার্য্যের নয়নকোণে দুই বিন্দু অশ্রু। সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইলে কি হয়, মানুষ মানুষ তো বটে। এই দুই মানবদেবতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাদের অগণ্য শিষ্যগণ, উজ্জয়িনীর রাজপথ মুখরিত করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিলেন :—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥
নলিনীদলগতজলমতি তরলম্
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ ॥

সুরবরমন্দির তরুমূলবাসঃ
শয্যা ভূতল মজিনং বাসঃ
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥
অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥

সমাপ্ত।

আটআনা সংস্করণ গ্রন্থমালা—

যুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্বপ্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এ চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং 'বড়বাড়ী', 'অরক্ষণীয়া' ও 'ধর্ম্মপালের' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

যে আশা লইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, ভগবৎপ্রসাদে ও সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আমাদের সে আশা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। "ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।" শ্রম সার্থক হইলে হৃদয়ে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। আমরাও অনেক কার্য্যের কল্পনা করিতেছি। এই সিরিজের উত্তরোত্তর উন্নতির সহিত একে একে সেই সঙ্কল্পগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজে'র স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

এই গ্রন্থমালার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। অভাগী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। পল্লীসমাজ (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৫। বিবাহবিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি-এল্।
৬। চিত্রালী—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। দূর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
৮। শাশ্বতভিখারী—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। বড় বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। অরক্ষনীয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১৫। লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। সুখের ঘর শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের
কয়েকখানি অপূর্ব্ব-রত্ন

বিনিময়।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নূতন ধরণের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস—দার্শনিক বলেন, জগতের একবিন্দু কর্ম্ম নিষ্ফলে যায় না। তাহার বিনিময় আছে, বৈষম্য আছে, নাই বাধা—নাই বৈফল্য! বঙ্গ সংসারের খুটি নাটি কাজেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই তাই অনভিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁহার সেই আকর্ষণী শক্তিশালিনী আবেগময়ী ভাষায় নিপুণতার সহিত "বিনিময়ে" বঙ্গ-সংসারের এক নিখুঁত ফটো তুলিয়াছেন। মনোজ্ঞ বাঁধাই ও বহুচিত্র শোভিত। মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা। ডাকব্যয় ৵৹।

নারীলিপি।—একাধারে নারীলিপি ও নারী-গীতা! শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। পত্রগুলি এমনই কৌশলে রচিত যে ইহাদের ভিতরেই রমণী-দিগের অবশ্য পালনীয় প্রায় সকল নীতিকথারই উল্লেখ আছে। এই উপদেশ গুলি পালন করিয়া চলিলে, রমণীগণ সত্য-সত্যই লক্ষ্মীস্বরূপা হইতে পারিবেন। এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া পুস্তকখানি রমণী সমাজের বিশেষ কল্যাণকর হইয়াছে। প্রত্যেক প্রিয়পাত্রীকে একখানি উপহার দিতে ভুলিবেন না। মূল্য ১৷৹, ডাকব্যয় ৵৹ আনা।

কুললক্ষ্মী।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রত্যেক বঙ্গ-রমণীর অবশ্য পাঠ্য। কি করিয়া আমাদের বালিকারা লক্ষ্মীস্বরূপা এবং স্বামীগৃহে প্রবেশ করিয়াই সকলের মনোরঞ্জন করিয়া 'কুললক্ষ্মী' বলিয়া পরিচিতা হইতে পারেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া যে রমণী ইহার উপদেশ পালন করিবেন, তাঁহাকে আর শ্বশুর-গৃহে কাহারও অনাদর সহ্য করিতে হইবে না। পাঁচখানি বহুবর্ণে অতি সুন্দর চিত্র ভূষিত, রঙ্গিন ছাপা, অতি উৎকৃষ্ট বাঁধা—মূল্য ১৲ টাকা ও ডাকব্যয় ৵৹।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।—পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত। একাধারে ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, জীবন-চরিত, উপন্যাস, গুপ্তকথা ও রসকথা! ভারতবর্ষের তীর্থ স্থানের কাহিনী আছে। কত শত খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবন চরিত আছে। দেশের কথা সংসারের কথা—পুরাণের কথা—ইতিহাসের কথা—বড় লোকের কথা—গেরোস্তের কথা—

গুপ্তকথা—রসের কথা,—ইত্যাদি কৌতূহলোদ্দীপক নানা কথায় "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ। মূল্য যৎসামান্য, মাত্র ২৲ ডাকব্যয় ।/০ ।

বাণী ও কল্যাণী। কবি রজনীকান্ত সেনের সাহিত্য সাধনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ফল। "বাণী" ও "কল্যাণী" রচনাই কবিবরকে অমর করিয়াছে। কবিবরের 'কান্ত পদাবলী' বঙ্গের নরনারীর প্রাণে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। বাণী ও কল্যাণীর সঙ্গীতগুলি ত্রিস্রোতের ন্যায় —ভক্তি, প্রেম ও হাস্যরসের ত্রিধারায় বিভক্ত। ইহার প্রতিছত্র "বাণী পঞ্চমে বোলেরে"। জন্মভূমির দারুণ ব্যথায় কোথাও গাহিয়াছেন,—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই"

আবার কোথাও—ভগবদ্ভক্তির গভীর গদ্‌গদ ধ্বনি বাহির হইয়াছে। সিল্কপ্যাড্ বাঁধাই, মূল্য প্রত্যেক খানি ১৲ এক টাকা। উপহারের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

সাবিত্রী-সত্যবান।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। সাবিত্রী-সত্যবান উপহার রাজ্যে ও স্ত্রীশিক্ষা সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সতীকুলরাণী সাবিত্রীর কাহিনী পাঠ না করিলে নারীজন্ম ব্যর্থ হয়। প্রত্যেক হিন্দুনারীরই ইহা দেবতার নির্ম্মাল্য বোধে মাথায় রাখা ও রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় নিত্য পাঠ করা উচিত। এই সংস্করণে গ্রন্থ-কলেবর আরও সুশ্রী ও মনোহর করা হইয়াছে। মূল্যবান্ আসল লাল সাটিন সিল্ককাপড় প্যাড বাঁধাই ও বহুবর্ণের 'সাবিত্রীর ত্রিরাত্র ব্রত' চিত্রাবরণে মণ্ডিত।—পাতায় পাতায় সৌন্দর্য্য—একাধারে উপদেশ ও উপভোগ—ছত্রে ছত্রে শিক্ষা। মূল্যাদি বর্দ্ধিত হয় নাই, পূর্ব্বমূল্য ১॥০ মাশুল ।০ আনা।

পদ্মিনী।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। পৌরাণিক যুগে সাবিত্রী যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, ঐতিহাসিক যুগে পদ্মিনীর সেই স্থান। যিনি সতীত্ব, ধর্ম্ম, ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অকাতরে ভীষণ জহরানলে দেহ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাঁহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রাজস্থান এখনও গৌরবান্বিত,—সেই সতীর পুণ্য কাহিনী প্রত্যেক বঙ্গবধূকে উপহার দিন। প্রত্যেক বঙ্গের কুললক্ষ্মীই "ত্যাগ গরিমায়" বঙ্গদেশকে রাজস্থানে পরিণত করিবেন।—ঘরে ঘরে 'পদ্মিনী'র ন্যায় নির্ভীক নারীর সৃষ্টি হইবে।—একাধারে শিক্ষা দীক্ষা ও উপন্যাসের মাধুর্য্য। মূল্য ১॥০ টাকা, ডাকব্যয় ।০ আনা।

কঙ্কণচোর।—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।—সচিত্র ঐতিহাসিক বৃহৎ উপন্যাস, ৪৮০ পৃষ্ঠা। মহারাণী মুরলার সুবর্ণ-কঙ্কণ চুরির ব্যাপার হইয়া ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা।—চাণক্যের কূট রাজনীতি—চন্দ্রগুপ্তের আত্মত্যাগ

—মহারাণীর পতিভক্তি—তড়িতার অপূর্ব্ব লীলা—ইহাতে বিচিত্র লীলা—ইহাতে বিচিত্র নানা ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে। কি করিয়া চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মগধের নন্দবংশ ধ্বংস হয়—তাহার বিচিত্র চিত্র—'কঙ্কণচোরে' চিত্রিত আছে।—মূল্য ২৲ ডাকব্যয় ।০

শর্ম্মিষ্ঠা।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। শর্ম্মিষ্ঠার পিতৃভক্তি—আত্মত্যাগ, সকলের শিক্ষণীয়। এমন পবিত্র হৃদয়গ্রাহী স্ত্রীপাঠ্য পৌরাণিক কাহিনী, মনোজ্ঞ বাঁধাই, রঙ্গিন ছাপাই ও সুন্দর সুন্দর চিত্র ভূষিত, উপহারের এক টাকা মূল্যে আর পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই।—প্রত্যেক পিতাই তাঁহার সন্তান সন্ততিকে 'শর্ম্মিষ্ঠা' উপহার দিয়া 'পিতৃভক্তি' শিক্ষা দিন। মূল্য ১৲ ডাকব্যয় ৴০।

সীতাদেবী।—খ্যাতনামা প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত। সতীকুলরাণী জনম-দুঃখিনী সীতার জীবন কথা। ইহাতে রামায়ণের সূচনা হইতে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত—(অর্থাৎ সমস্ত রামায়ণ) অতি সুললিত সহজ ভাষায় বর্ণিত আছে। নূতন আকারে, বহু বর্ণের চিত্রাবরণ মণ্ডিত, তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। সিল্কের কাপড়ে, প্লাড বাঁধাই—মূল্য সেই এক টাকা মাত্র, ডাকব্যয় ৴০।

শৈব্যা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। সতী-সাবিত্রী "শৈব্যা"র অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য পাঠ করিয়া কোনও রমণীই অশ্রুপাত না করিয়া পারিবেন না। প্রত্যেক কুলাঙ্গনারই একখানি লইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করা উচিত। ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, পত্নী, আত্মীয়স্বজন, সকলকেই বিনা বিচারে সতীমাহাত্ম্য উপহার দিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাহিনী ও উপন্যাস। চতুর্থ সংস্করণে শৈব্যার সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য—১৷০ ডাকব্যয় ।০।

উমা।—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সংসারের স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। "উমা" একখানি মনোরম গৃহচিত্র—লেখক উপদেষ্টার আসন গ্রহণ না করিয়া—চিত্রশিল্পী হইয়া এই অপূর্ব্ব উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ—উমা চরিত্র—অঙ্কিত করিয়াছেন। উমার আদর্শে মাধুর্য্যে হৃদয় মুগ্ধ হয়। মূল্য ১৵০ ডাকব্যয় ৴০।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।